ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ।। ১০ শ্রাবণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৭ জুলাই, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

দাঙ্গারও শ্রেণীবিভাগ করছে ইউ পি এ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় বসেই দাঙ্গার শ্রেণী বিভাগ ও হিসাব করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমবার ক্ষমতায় বসে ইউ পি এ সরকার 'সাচার কমিটি' নিয়োগ করে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেনাতেও হিন্দু কত, মুসলমান কত তার হিসেব করিয়েছিল। এবারে দাঙ্গার সংখ্যা এবং 'হিন্দু-মুসলমান', 'হিন্দু-খৃস্টান' হিসেবে দাঙ্গারও শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে

পি চিদাম্বরম

ইউপিএ সরকারের আমলে ২০০৮ সালে ৯৪৩ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। ওই দাঙ্গায় ১৬৭ জন মৃত এবং ২,৩৫৪ জন আহত। তবে ২০০৭-এর হিসাবও উল্লেখযোগ্য। ওই বছরে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল ৭৬১ টি — নিহত ৯৯ জন, আহত ২,২২৭ জন। এসবই কেন্দ্র সরকারের 'দেশের সম্প্রদায়গত অবস্থান' শীর্ষক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপরই শ্রেণী বিভাগ — 'হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক অবস্থান' শীর্ষক রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ২০০৮-এ — চারটি দাঙ্গাসহ ৬৫৬টি হিন্দু-মুসলিম সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় ১২৩ জন নিহত এবং ২,২৭২ জন আহত হয়েছে।

২০০৮-এ সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের ঘটনার বেশিরভাগ ঘটেছে — মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং কর্ণাটকে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে গত বছরের ৩ জুলাই। সেখানে আটজন মৃত এবং ৩০ জন আহত হয়েছে। গত বছর পাঁচ থেকে আট অক্টোবর মহারাষ্ট্রের ধূলেতে যে দাঙ্গা হয় সেখানেও নয়জন নিহত এবং ১৭৬ জন আহত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদে গত বছর ১০-১২ অক্টোবর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় দশজন নিহত এবং চারজন আহত হয়। মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরে হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গায় (১১ অক্টোবর, '০৮) ন'জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছিল।

সরকারি নথিতে এরপর শীর্ষক রয়েছে 'হিন্দু-খৃস্টান সাম্প্রদায়িক স্থিতি'। সেখানে বলা হয়েছে ২০০৮-এ ২৮৭টি হিন্দু-খৃস্টান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সারা

(এরপর ৪ পাতায়)

বন্‌ধে বিশৃঙ্খলা সি পি এমের পরিকল্পিত

গূঢ়পুরুষ ।। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের ধান্যরুখী গ্রামের পথে দলীয় বিধায়কদের উপর সি পি এম হার্মাদদের হামলার প্রতিবাদে ১৭ জুলাই রাজ্য কংগ্রেসের ডাকা বাংলা বন্‌ধের দিনে রাজ্যবাসী যে নৈরাজ্য দেখেছেন তা অকল্পনীয়। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের অতি উৎসাহ এবং বুদ্ধিহীনতার জন্যই সি পি এম দলের পাতা ফাঁদে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পা দিয়ে যথেচ্ছভাবে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে রাজ্যজুড়ে দু'দিন সন্ত্রাস রাজ কায়েম করেছে। আলিমুদ্দিনের নেতারা ঠিক এইটাই চেয়েছিল। অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি দেখা যায় যে কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনীতে কৌশলে সি পি এমের হার্মাদদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানস ভুইঞা, সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে বিমানবাবু-বুদ্ধবাবুদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা কোনও গোপন কথা নয়। কংগ্রেসের এই দুই নেতাই ১৭ জুলাই বাংলা বন্‌ধ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর রাজ্যজুড়ে যে তাণ্ডব হয় এবং পুলিশ-প্রশাসন যে নিষ্ক্রিয় থাকে তাও ৩২ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে ঘটেনি। এই সবই ঘটেছে আলিমুদ্দিনের ছকে দেওয়া প্ল্যান অনুসারে।

সি পি এম নেতারা চেয়েছিল রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনী সন্ত্রাসরাজ কায়েম করলে পার্টি জোরদার প্রচার শুরু করবে যে কংগ্রেস আবার ৭০-এর দশকের নৈরাজ্য বাংলায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে। অর্থাৎ কংগ্রেস-তৃণমূল জোটকে সমর্থন করার অর্থ নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসকে সমর্থন করা। স্বীকার করতেই হবে যে সি পি এমের এই প্রচার কলকাতার নাগরিকদের বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছে। তৃণমূল জোটসঙ্গী হিসাবে কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। বাস্তবে কিন্তু তৃণমূল কর্মীরাও কংগ্রেসের ভৈরব বাহিনীর দলে ভিড়ে যায়। এখন তৃণমূল নেত্রী সি পি এমের ফাঁদে পা দেওয়ার জন্য রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে দুষছেন। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এমন হঠকারি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে নিলে তৃণমূল সমর্থন দেবে না। মমতা এমন কথাও বলেছেন যে এই দুই দলের জোট শুধুমাত্র নির্বাচনভিত্তিক। নেত্রী বলেছেন নির্বাচনের বাইরে অন্য কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে জোট হয়নি। মমতা তাঁর দলীয় নেতাদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই বলে যে তাঁর নির্দেশ ছাড়া তৃণমূল নেতারা কংগ্রেসের কোনও অনুষ্ঠানে যাবেন না। এর থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের এই বিরোধী জোটের সম্পর্ক কতটা ঠুনকো। একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আগস্ট মাসে কলকাতার শিয়ালদহ ও বৌবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোরদার কাজিয়া হবেই। সি পি এম কৌশলে এই দুই দলের মধ্যে বিভেদ তৈরি করবে। এখন প্রণববাবু এবং মমতা কীভাবে সি পি এমের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে যেতে পারেন সেটাই দেখার। মনে রাখতে হবে পার্টির কর্মী সমর্থকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে কলকাতার এই দুটি হারা আসন জিততে সিপিএম

সরকারি বাসে আক্রমণ। ইনসেটে আগুনের কবলে একটি বাস।

এবার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

মঙ্গলকোটের ঘটনার নিন্দা সমস্ত রাজনৈতিক দলই করেছে। গণতন্ত্রের পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ। সিপিএম নেতারাও নিন্দা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীমশাই তো বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন মঙ্গলকোটে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যেতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না। বাস্তবে এ সবই অসত্য প্রতিশ্রুতি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি দৈনিকের দুই সাংবাদিক কার্তিক বেঙ্কটরমন ও শুভম দত্ত উপদ্রুত ধান্যরুখী গ্রামে ১৮ জুলাই যান। তাঁরা গ্রামে পৌঁছনো মাত্রই সি পি এমের হার্মাদরা চড়াও হয়ে এই দুই সাংবাদিককে ব্যাপক মারধর করে। তাঁদের ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ সব ছিনতাই হয়ে যায়। তাঁরা মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। লিখিতভাবে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানিয়েছেন। কোনও ফললাভ হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ, নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের পর সি পি এম বিনা যুদ্ধে একটিও গ্রামে বিরোধীদের ঢুকতে দেবে না। বলাবাহুল্য যে, পার্টির চোখে সংবাদমাধ্যমও বিরোধী দল। একটা সহজ-সরল কথা এবার রাজ্যবাসীকে বুঝে নিতে হবে যে ২০১১ সালে বিধানসভার নির্বাচনে সি পি এম মরণ কামড় দেবে। রাজ্যজুড়ে সেই হিংস্র মানসিকতার দায় পার্টি কৌশলে বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দেবে। সেই কৌশলের একটা চেহারা আমরা বাংলা বন্‌ধের দিন দেখেছি। রাজনৈতিক বুদ্ধিহীন তরমুজ রাজ্য কংগ্রেস নেতারা সি পি এমকে সাহায্য করতে পা বাড়িয়েই আছেন।

দুর্নীতিতে জড়ালেন এ আই সি টি ই-র চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দুর্নীতির অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক পরিচালিত সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ বা এ আই সি টি ই (অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন)-এর বিরুদ্ধে। যে সংস্থার (এ আই সি টি ই) দিকে চেয়ে থাকেন আগামী দিনের ইঞ্জিনিয়াররা সেই সংস্থারই চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এই অভিযোগে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছে ইউপিএ সরকার। সি বি আই এখনও পর্যন্ত এ আই সি টি ই-র চেয়ারম্যান আর এ যাদব, পরামর্শদাতা অধ্যাপক এইচ সি রাই, রিজিওনাল অফিসার ওম দালাল এবং ডেপুটি ডিরেক্টর রোমিনদার রানধাওয়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় পিনাল কোডের ১২০ বি ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি বিরোধী আইন, ১৯৮৮ অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করেছে। এই ঘটনায় স্বভাবতই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী কপিল সিবাল। কারণ দুর্নীতিতে এ আই সি টি ই-র নাম সর্বাগ্রে জড়ালেও তাঁর মন্ত্রকের অধীন এই কারিগরি শিক্ষার সরকারি দপ্তরটির থাকার দরুণ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রীর নাম কিন্তু বারেবারেই উঠে আসছে। শেষ পর্যন্ত অস্বস্তি এড়াতে সিবাল সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় সি বি আই এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে এ আই সি টি ই-র সদস্য সম্পাদক কে নারায়ণ রাও এবং এস বি

আর এ যাদব

সুব্বারাও-কে। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ-এ অবস্থিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে এ আই সি টি ই-র অনুমোদন প্রাপ্তির টোপ দিয়ে কলেজ মালিকের কাছ থেকে প্রথম কিস্তির পাঁচ লক্ষ টাকা নেবার সময় সি বি আই তাঁদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া এ আই সি টি ই-র সদস্য সম্পাদক কে নারায়ণ রাও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক করেন কালিকটের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে। পরে মাদ্রাজ আই আই টি থেকে এম টেক করেন এবং কর্ণাটকের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট করেন। ওই আই আই এসসি থেকে তিনি ১৯৮৫ সালে স্বর্ণপদকও লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক নেলসন অকাসটিক পুরস্কারও লাভ করেন। এহেন শিক্ষিত ও সম্মানীয় ব্যক্তি সামান্য একজন মধ্যস্থতাকারী সুব্বারাও-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই জঘন্য কাজে নামলেন কেন প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। এই নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও অবধি কাটেনি। সেই সাথে আরও একটা মারাত্মক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এ আই সি টি ই-র বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী কেদারনাথ বনসাল অভিযোগ করেন এ আই সি টি ই-র চেয়ারম্যান, পরামর্শদাতা এবং ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছে কে নারায়ণ এবং এস বি সুব্বারাও-এর নামে অভিযোগ করলেও তাঁরা সেই অভিযোগে কর্ণপাত করেননি। সিবিআই মুখপাত্র বলেছেন, অভিযুক্ত ওই চার ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগকারীকে হেনস্থা করেন ও টাকা চেয়ে বসেন।

সি বি আই-এর হাতে ধরা পড়া এ আই সি টি ই-র ওই পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা অন্ধ্রের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির এ আই সি টি ই-র বৈধতাপ্রাপ্তির ন্যায্য দাবী থাকলেও ঘুষ না দেওয়ার কারণে ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ কলেজ চালু করতে এবং পরে কলেজের কাজও পরিসর বৃদ্ধি

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

জমি আন্দোলন এবার বীরভূমে
অধিগৃহীত জমির দখল নিল চাষীরা

বিশেষ সংবাদদাতা : বীরভূম ।। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে শিল্প-তালুক করার নামে জমি অধিগ্রহণ হলেও কোনও শিল্প না হওয়ায়, ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে পুলিশের সামনেই জমির দখল নিয়ে চাষ শুরু করল এলাকার চাষীরা। গত ৮ জুলাই বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীরভূমের বোলপুরের রায়পুর-সুপুর অঞ্চলের শিবপুর মৌজায় ২০৪ একর শিল্প তালুক করার জন্য অধিগৃহীত জমিতে লাঙল চালিয়ে চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয় এলাকার চাষীরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে ওই শিল্পতালুক এলাকায়। এদিন চাষীরা অধিগৃহীত জমিতে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢুকতে গেলে বোলপুর থানার আইসি এবং এসডিপিও-র সঙ্গে হাতাহাতি হয়। এরপরই হাজার হাজার সমর্থক জোর করে বেড়া ভেঙে ৬ জোড়া গোরু লাঙল নিয়ে এই জমিতে চাষ শুরু করে। বাকি চাষীরা কোদাল নিয়ে নিজের মধ্যে জমি ভাগাভাগি করে জমির আল কাটতে শুরু করে। সমস্ত ঘটনাই কার্যত জেলা পুলিশের সামনে ঘটে যায়। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়।

এই ঘটনার পর শিল্প তালুকে জমিহারা চাষীরা জানায়, আজ আমরা আমাদের জমির দখল নিলাম। কারণ শিল্প করার নামে জেলা প্রশাসন আমাদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নেয়। অথচ আজও কোনও শিল্প না হওয়ায় আমাদের আর্থ-সামাজিক কোনও উন্নয়ণই হয়নি। উল্টে আমরা এখন অন্যের জমিতে দিন-মজুরী করি।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ণ নিগমের চেয়ারম্যান থাকাকালীন বোলপুরের সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে বোলপুরে শিল্প বিকাশকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বোলপুর ব্লকের রায়পুর-সুপুর গ্রামে ২০৪ একর জমির উপর শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ণ নিগম সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারপর থেকে গত ৯ বছর কোনও শিল্প সংস্থাকেই এই শিল্পতালুকে আনতে পারেনি রাজ্য সরকার।

ফলে ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ণ নিগমের মাধ্যমে সরকারি দরপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি পুঁজি আহ্বান করে বোলপুর শিল্প-তালুক গড়ার জন্য শান্তিনিকেতন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড গঠন করে। সেই সময় অধিগৃহীত শিল্প-তালুকের জমিতে আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিলে এলাকার চাষীদের চরম বিক্ষোভের মুখে পড়ে শিল্প-তালুক কর্তারা।

জিরো পয়েন্টে বেড়ার কাজ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি

সংবাদাতা ।। জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক শান্তনু দাস গত ১৩ জুলাই বিলোনীয়া সফরে এসে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা সদর যেগুলি সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে দেড়শত গজের মধ্যে যেমন বিলোনীয়া শহর, সাব্রুমের কিছু অংশ, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর, কমলপুর, মোহনপুর, সোনামুড়া, খোয়াইয়ের কিছু অংশ — এগুলিতে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে শহরটাই বাইরে পড়ে যাবে। এর জন্য বি এস এফের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকারের রেভিনিউ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠিয়েছে। বিলোনীয়া শহর, সাব্রুম শহর ইত্যাদি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে কি রকম এলাইনমেন্ট হবে? তবে এটা যেহেতু আন্তর্দেশীয় ব্যাপার এটা নির্ভর করছে ভারত সরকারের উপর। আমরা ম্যাপ সহ সমস্ত তথ্য দিয়ে পাঠিয়েছি।

ভারত সরকারের সেক্রেটারি, বর্ডার ম্যানেজমেন্ট এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, এসব শহর এলাকায় বিকল্প কিছুই নেই। দেড়শ গজের বাইরে বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলা হবে। দক্ষিণ জেলায় ১৩ থেকে ১৫ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়ার কাজ বাকি রয়েছে।

কৃষক এবং বিএস এফ-এর সাথেও জেলাশাসক কথা বলেন। কৃষকরা ডি এম এর কাছে অভিযোগ করে বলেন, ফেন্সিং এমনভাবে করা হয়েছে যে, বৃষ্টির ফলে অনেক জমিতে জল বেশি জমে যাচ্ছে। আবার কোথাও জল থাকছেনা। কাঁটাতারের বেড়ার কাজে ভিতে যে পাইপ লাগানো হয়েছে তা অত্যন্ত সরু। ঠিকভাবে জল নিষ্কাশন হয় না। এছাড়া কাঁটাতারের বাইরে চাষবাস নিয়ে গেট খোলার ব্যাপারে বি এস এফ-এর ভূমিকায় কৃষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডি এম শান্তনু দাস বি এস এফ-কে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে বি এস এফ-এর ডি জি-র সাথে কথা বলার বিষয়ে কৃষকদের আশ্বাস দেন। বর্ডার ফেন্সিং-এর অত্যন্ত নিম্নমানের কাজের অভিযোগ নিয়ে ডি এম বলেন, এটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

বিলোনীয়া সফরে এসে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সেদিনই বিলোনীয়া শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে প্রস্তাবিত রেলস্টেশন উত্তর সোনাইছড়ির শত্রুঘ্ন পাড়া জে বি স্কুল এলাকাও সফর করেন। ডি এম-এর সাথে বিলোনীয়ার এস ডি ও সঞ্জয় চক্রবর্তীসহ অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা ছিলেন।

এই সময়

আর্থিক বিকাশ

মধ্যপ্রদেশের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সম্প্রতি আর্থিক বিকাশের এক উচ্চস্তরের বৈঠকে ১৩ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব পাশ হয়। এই টাকা রাজ্যের স্টীল, সিমেন্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। যা শিল্পের পাশাপাশি নাগরিক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। রাজ্যের সার্বিক বিকাশের কথা মাথায় রেখেই শ্রীচৌহান এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

অশনি সংকেত

এখনও নিরাপদ নয় ভারত। পাকিস্তানী জঙ্গি সংগঠনগুলি আবারও আক্রমণ চালাতে পারে। এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন বি এস এফের ডাইরেক্টর জেনারেল এম এল কুমাওয়াত। তাঁর মতে, জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টাও চালাচ্ছে জঙ্গিরা। তবে এর পাশাপাশি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বি এস এফও যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে এই বিষয়ে। তিনি নিরাপত্তা যথেষ্ট জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানী জঙ্গি সংগঠন এর আগেও সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে। ফলে নিরাপত্তার পাশাপাশি সতর্কতারও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

সংস্কৃত গান

এবার সংস্কৃতে গান গাইবেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের সংস্কৃতে রচিত স্তুতির ওপর সুর দেবেন তিনি। সন্ত কবি টি ওন্নামাচার্যের লিখিত স্তুতির ওপর তিনি গান গাইবেন বলে জানা গেছে। তিরুমালাই তিরুপতি দেবস্থানের পক্ষ থেকে লতার গলায় গান রেকর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কবি ওন্নামাচার্যের গান গাওয়ার সুযোগ পেয়ে লতা মঙ্গেশকরও যথেষ্ট গর্বিত।

তথ্য চড়কগাছ

সম্প্রতি ইন্ডিয়া টু-ডে-এর দেওয়া তথ্য পড়লে আপনারও বিষম লেগে যাবে। এই তথ্য থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশার চিত্রটাও। ২০০৭ সালের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে প্রায় অর্ধেক বাচ্চা সরকারি স্কুলে পাঁচ বছর ধরে লেখা-পড়া করেও, সমান করে লিখতে-পড়তে শেখে না। এদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৪০ শতাংশ প্রশিক্ষিত ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ভারতের ৯.১৯ শতাংশ গ্রামে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত স্কুলে একটিমাত্র শ্রেণী কক্ষেই লেখা পড়া করতে হয় (০৭-০৮)। অথচ আশ্চর্যের ঘটনা হল ভারত বিশ্বের তৃতীয় রাষ্ট্র, যেখানে বড় মাত্রায় উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

প্রকৃত উন্নয়ণ

অনান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন কেন্দ্রের টাকা ব্যবহার না করার অভিযোগ উঠছে ভুরিভুরি, সেক্ষেত্রে অন্য চিত্র দেখা গেল ছত্তিশগড়ে। রাজ্যে বৃক্ষরোপণে ছত্তিশগড় সরকার কেন্দ্র থেকে ১৩০ কোটি টাকা পেতে চলেছে। কেন্দ্রীয় বন ও পর্যাবরণ দপ্তর থেকে এই টাকা দেওয়া হবে। ওই টাকার মধ্যে বেশ কয়েক কোটি টাকা গত বছর ধরে কেন্দ্র সরকারের কাছে পড়ে আছে। রাজ্য পর্যাবরণের উন্নয়ণেই এই টাকা ব্যয় করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

লক্ষ্য সংস্কৃতি

কয়েকদিন আগে আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়ার বিভিন্ন স্কুল পাঠ্য থেকে হিন্দুত্বের বিষয়গুলি ছেঁটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি আমেরিকার ওরেগন প্রদেশের আইনসভায় এমন বিল পেশ হয়েছে, যেটিতে সুকৌশলে শিখদেরকে টার্গেট করা হয়েছে। বিলটিতে শিক্ষকদের ধর্মীয় প্রতীক বসানো পোষাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসা যাবে না বলে বলা হয়েছে। এতেই বিতর্ক বেঁধেছে শিখদের মধ্যে। বেশিরভাগ শিখেরই পোষাকে ধর্মীয় প্রতীক থাকে। অনেকের পাগড়িতেও। ফলে এমন বিল পেশ হলে, পরোক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতাতেই হস্তক্ষেপের সমান। প্রবাসী শিখেরা ইতিমধ্যেই বিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে।

বায়োলজি অলিম্পিয়ার্ড

ইন্টারন্যাশনাল বায়োলজি অলিম্পিয়াড-এও ভারতীয় ছাত্ররা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিল। কুড়িতম এই অনুষ্ঠানে ৫৬টি দেশ থেকে ২২০ জন বিদ্যার্থী উপস্থিত ছিলেন। ভারত থেকে ছিলেন ৪ জন ছাত্র উপস্থিত। জাপানে অনুষ্ঠিত বায়োলজি অলিম্পিয়াড-এ ভারতের ৪ ছাত্রই মেডেল নিয়ে দেশে ফেরে। এর মধ্যে রাজস্থানের যোধপুর থেকে ভিধি হথি স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাকিরা রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ-এর পদক লাভ করেন। প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের দরবারেও ভারত তার উজ্জ্বল দিক তুলে ধরতে সফল হয়েছে।

মহাকরণ চলো

গত ২১ জুলাই ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে 'মহাকরণ চলো' বলে হাঁক পেড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবছেন বুঝি তৃণমূলের নতুন কোনও আন্দোলনের পরিকল্পনা? একদমই তা নয়। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ চলো ডাক দিয়ে যে আইন অমান্য আন্দোলনে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণে ওই ঘটনার ১৭তম বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক পথে মহাকরণ দখলের ডাক দিলেন মমতা। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে তিনি বললেন, ক্ষমতায় এলে আর আমরা-ওরা নয়, হবে আমাদের।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জোট নিরপেক্ষ বৈঠকে ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা

মিশরের শার্ম-এল-শেখ নামক সুরম্য রিসর্টে বসিয়াছিল জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠক। আর ঠিক ইহার পূর্বেই মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটন তাহার ভারত-পাকিস্তান ভ্রমণের দিনক্ষণও বাছিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ কি কেবলই কাকতালীয়? না কি পূর্ব-পরিকল্পিত? চাক্ষুষ প্রমাণ তো কিছু নাই, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতের প্রমাণটাও তো প্রমাণ। তাহা না হইলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মুম্বাই আক্রমণের পর হইতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেরূপ হম্বিতম্বি করিতেছিলেন, প্রথম দিকে তো সন্ত্রাসবাদীদের বিশাল তালিকা বানাইয়া পাকিস্তানকে হুমকি দিয়াছিলেন এই বলিয়া যে 'পাকিস্তান অবিলম্বে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের ভারতের হাতে তুলিয়া না দিলে ভারত এমনকী সামরিক ব্যবস্থা লইতেও দ্বিধা করিবে না।' নির্বাচন যত আগাইয়া আসিয়াছে তাহার হুঙ্কার ততই চরমে উঠিয়াছিল। এই যুদ্ধ লাগে, এই যুদ্ধ লাগে ভাব। নির্বাচন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো সনিয়ার মনমোহন সরকারও মূষিকে পরিণত হইয়াছে। সিংহের গর্জন বিড়ালের 'মিউ মিউ'-তে পরিণত হইয়াছে। 'সন্ত্রাসবাদীদের ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ না করিলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কথা নয়, কোনও বৈঠক নয়।' এই দাবী পরিবর্তিত হইয়াছে রাতারাতি। সন্ত্রাসবাদীদের ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করিবার দাবী হইয়াছে পাকিস্তান সরকার সন্ত্রাসবাদীদের যথোচিত শাস্তি দিক।'

অর্থাৎ সুকৌশলে পিছাইয়া আসিলেও কিন্তু গরম গরম বুলি অব্যাহতই ছিল। পাকিস্তান যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দিতেছে ততক্ষণ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়। এই ধরনের আগমার্কা স্লোগান দেওয়া অব্যাহত রাখিয়াছিল কংগ্রেস সরকার। পাকিস্তান কিন্তু তাহার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা ভারতে সন্ত্রাসবাদী রপ্তানী বন্ধও করে নাই। অথচ ভারত সরকারও ক্রমশ তাহার দাবী পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছে। কিছুদিন ধরিয়া ভারত বলিতে লাগিল "যতদিন না পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাসবাদী রপ্তানী বন্ধ করিবে ততদিন পাকিস্তানের সহিত কোনও আলোচনা নয়, বৈঠক নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মাত্র এই জুলাইয়ের নয় তারিখেই অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গিলানীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের যৌথ বিবৃতির মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে, আমাদের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা সংসদে বলিলেন, "পাকিস্তান সরকার আমাদের আশ্বাস দেওয়ার পরও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।'

আমাদের বিদেশমন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত এই বিবৃতির মাত্র ৭ দিন পর ১৬ জুলাই '০৯ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মিশরের সুরম্য শার্ম-এল-শেখ রিসর্টে বসিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীর সহিত এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়া বসিলেন। নির্বাচনের আগে এত হুংকার, এত গর্জন, এত নীতি, এত আদর্শের কচকচানি বিসর্জন দিয়া লিখিলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সার্বিক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা উচিৎ হইবে না এবং ইহাকে এক বন্ধনীর মধ্যে রাখা উচিৎ হইবে না।"

মনমোহনজীর এই বিবৃতি বহুদিন ধরিয়া ভারতের কাছে এক ব্যাপক যন্ত্রণা ও বেদনার কারণ হইয়া থাকিবেই। কারণ এই বিবৃতি কেবলমাত্র পাকিস্তানের বর্তমান সরকারই নয়, ভবিষ্যৎ সরকারকেও আন্ত-সীমানা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মতো অন্যায় কার্যকলাপকেও অব্যাহতি দিয়া দিবে। ইহাই যদি মনে ছিল তাহা হইলে ডিসেম্বর হইতে এত কথার ছলনে ভুলানো কেন? ডিসেম্বরে মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলার পরেই তো এই সার্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ঢাক পিটাইতে পারিতেন। কিন্তু নির্বাচন বড় বালাই। তাই মনের ইচ্ছা তিনি মনেই পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াই কংগ্রেসীদের চিরপরিচিত মুসলিম তোষণ-পাকিস্তান তোষণের মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে।

ভারত বরাবরই তাহার যুদ্ধ ক্ষেত্রের সামরিক জয়লাভকে কূটনৈতিক জয়লাভে পরিণত করিতে পারে নাই। সে ১৯৬৫'র যুদ্ধে জয়লাভের কথাই ধরুন কিংবা ১৯৭১-র যুদ্ধে জয়লাভের কথাই ধরুন। কূটনীতিতে বরাবরই আমরা হারিয়াছি কারণ আমাদের ঘরোয়া কংগ্রেসী নির্বাচনী রাজনীতি সব সময়েই এই পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইবারের মনমোহনজীর কান্ডকারখনাও সেই ধারাবাহিকতাকেই অটুট রাখিয়াছে।

আমাদের বিদেশমন্ত্রীর ওই উপরোক্ত বিবৃতি এবং পাকিস্তানী রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির সাম্প্রতিক বিবৃতিতে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের পাকিস্তানের হিরো বলিয়া বর্ণনা করিবার পরও মনমোহনজীর এই যৌথ বিবৃতি কাহার স্বার্থে? জাতির স্বার্থে তো মোটেই নয়। জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে পাকিস্তান যেখানে ভয় পাইতেছিল যে তাহারা সন্ত্রাসবাদী বলিয়া অভিযুক্ত হইতে পারে সেখানে পাকিস্তানই ভারতকে সন্ত্রাসবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছে বালুচিস্তানে। বালুচিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পিছনে নাকি ভারতেরই হাত আছে বলিয়া পাকিস্তান অভিযোগ করিয়াছে। আর এই বিবৃতি দিয়াছে লিখিতভাবে এবং তাহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরও আছে। সাংবাদিক সম্মেলনে কিছু বলিলে তাহা রেকর্ড হয় না কিন্তু যৌথ বিবৃতি দুই দেশের মধ্যে একটি লিখিত নথিতে পরিণত হয় — ইহা কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানেন না। তাহা হইলে আর এমন প্রধানমন্ত্রী কি প্রয়োজন? দেশের নিরাপত্তার জন্য এই প্রধানমন্ত্রীর উপর দেশ নির্ভর করিবে কেমন করিয়া?

আধ্যাত্মিকতা কি হিন্দুদের রাজনীতিবিমুখ করছে?

পি দিবামুখু

বিগত লোকসভার নির্বাচনে (২০০৯) অনেকেই কংগ্রেসের তথা ইউ পি এ-এর প্রশংসা জানিয়েছেন। কিন্তু কেউই হিন্দু ভোটারদের বিশাল সংখ্যায় ভোট দিতে অনুপস্থিত থাকার কথা বলেননি। সব মুসলিম ও খৃস্টান ভোটাররাই প্রতিটি নির্বাচনে যেখানে ধর্মীয় কারণে ভোট দিয়েছেন, সেখানে কতজন হিন্দু ভোটাররা ভোট দিয়েছেন? এই সম্পর্কে প্রায় ১০০ জন হিন্দু ভোটারকে ফোন করে আমরা জানতে পারলাম, তাঁরা বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের বড় বড় পদাধিকারী হলেও কেউই ভোট দিতে যাননি।

ওই হিন্দু সংগঠনগুলি বহু সামাজিক পরিষেবা করে চলেছেন। যেমন, শিশু মন্দির, বৈদিক স্কুল, কলেজ, গোশালা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগ শিক্ষাদান ইত্যাদি, বহু হিন্দু এই সব প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করছেন। এঁরাও ভোটদানে বিরত ছিলেন। নতুবা মুম্বই শহরে ২৬।১১-এর বিস্ফোরণের পরেও কিভাবে এটা সম্ভব হয়? এর কারণই বা কী?

জাতীয় স্বার্থে হিন্দুদের ভোটদানে বিরত থাকা হিন্দু রাজনীতিবিদদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নির্বাচনে গড়ে ৫৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায় ভোট দিলেও হিন্দুরা বেশি সংখ্যায় ভোট না দিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৩ শতাংশ মুসলমান ও ৩ শতাংশ খৃস্টান ভোট দিয়েছেন ধরে নিলেও ৩৯ শতাংশ হিন্দু ভোটার ভোট দেননি। অতএব দেখা যাচ্ছে, যদি একটি দল মাত্র ১/৮ অংশ অর্থাৎ ৫ শতাংশ হিন্দুর ভোট পায় (মুসলিম ও খৃস্টান ভোট সহ) তাহলে মোট ভোট সে পাচ্ছে ২১ শতাংশ, আর তাতেই সে জিতে যাচ্ছে, বাকি ৩৪ শতাংশ হিন্দু ভোট ভাগ হয়ে বিভিন্ন দলের প্রার্থী পেয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের ভোট না দেওয়ার এই মনোভাব কংগ্রেস ভালো করেই জানে। সেজন্যই তারা ধূর্তের মতো শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পাওয়ার জন্য মুসলিম ও খৃস্টানদের তোষামোদ করে চলেছে। এবং এইভাবেই তারা ২০৬টি আসন পেয়ে গেছে। এইসঙ্গে রাজ থ্যাকারে, চিরঞ্জীবী ও ডি এম ডি কে (বিজয়দান্ত) ভোট ভাগ করায় কংগ্রেস জেতার জন্য আরও সাহায্য পেয়ে গেছে।

হিন্দুদের ভোটদানে বিরত থাকার কারণ কি? মোল্লা-মৌলবীরা প্রতি শুক্রবার নমাজের সময় বলেছেন কাকে ভোট দিতে হবে। খৃস্টানরাও তাই করে তাদের প্রার্থনা সভায়। কোথাও কোথাও স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে কৌশলী ভোটের কথাও বলা হয়। কিন্তু হিন্দু গুরু, সাধু-সন্ত, মোহান্ত বা আচার্যেরা এরকম করেন না। তাঁরা ঠিক এর বিপরীত আচরণ করেন। পাছে কেউ তাদের সাম্প্রদায়িক বলে, সেইজন্য তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের কাছে রাজনীতি করা পাপ। তাঁদের কাছে সব রাজনীতিক দলই সমান। অতএব তাঁদের নিরপেক্ষ থাকা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের শিষ্যবর্গরাও নিজ নিজ গুরুদের পথ অনুসরণ করেন। ভোট দেওয়া মানে একজনের পক্ষে বলা, অন্যজনকে শত্রু করা, অতএব ভোটদানের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ভোটদান না করাই ভালো। যখন হিন্দুধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, অসংখ্য মঠ, আশ্রমের অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যাও রয়েছেন, তখন হিন্দু বিরোধী রাজনীতিকরা ও অপরাধীরা ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করে চলেছে। হিন্দু বিরোধী রাজনীতিক ও অপরাধীরা চায় যে, মঠ ও আশ্রমের আধ্যাত্মিকতাবাদী হিন্দুরা যেন ভোটদানে বিরত থেকে রাজনীতির মধ্যে মাথা না গলান। এই সব মগজ-ধোলাই করা হিন্দুরা ভোটদান করা অশুভ বলে মনে করে ভোটদানে বিরত থাকেন, আর সেই সুযোগে খৃস্টানরা, মুসলমানরা ও সামান্য কয়েকজন হিন্দু নামধারী সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক নেতা রাজনীতির অঙ্গন দখল করে বসে। খৃস্টান-মুসলমানদের মিলিত ভোট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সামান্য কয়েকজন রাজনৈতিক হিন্দুর তুলনা করা যায় না। আরও বলা যায় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ধরে নেন যে, হিন্দুরা তাদের জাত-পাত, বর্ণবিদ্বেষ ভাষা প্রসঙ্গে এক না হয়ে বিভক্ত থাকুক। হিন্দুরা যদি কোনওভাবে একই পতাকার তলায় সংগঠিত হয়, তখনই তাঁদের 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়া হয়। যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগের সঙ্গে (যে দল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের জন্য দায়ী) এবং মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমনের সঙ্গে (একটি মুসলিম মৌলবাদী দল) জোট বেঁধেছে। তার এতদূর ঔদ্ধত্য বেড়েছে যে বিজেপি-র মতো দলকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, তারা তাদের অনুগত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভোটারদের বোঝাতে কৃতকার্য হয়েছে।

এই সব গুরু ও সন্তদের কাছে এমন কি Hindu Voice পত্রিকা পর্যন্ত অস্পৃশ্য। তাঁরা বলেন, শুধু তাঁদের কথা শুনেই আলোকিত হতে হবে, অন্য কারোর কথায় নয়। 'হিন্দু' নামটি তাঁদের কাছে ভীতিজনক মনে হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে যে, কীভাবে এই সব Spiritual Hindu কে Political Hindu-তে পরিবর্তিত করা যায়! অর্থাৎ বীর সাভারকরজীর ব্যাখায় Politicising Hindus and Hinduising Politics — হিন্দুকে রাজনীতির দৃষ্টিসম্পন্ন করা, রাজনীতিকে হিন্দু দৃষ্টিসম্পন্ন করা। আধ্যাত্মিকতা হিন্দুত্বের একটি অংশ, সন্দেহ নাই। গুরুদের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা মেনে নিলেও ভোট দেওয়ার থেকে হিন্দুদের দূরে রাখার চেষ্টার নিন্দা করা উচিত। এর অর্থ — হিন্দুকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। জাতীয় চেতনা বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতার কথা ভাবা যায়? জাতি যদি একটি শরীর হয় তবে আধ্যাত্মিক ভাবনা সেই শরীরের আত্মা। এই দুটিকে পৃথক কীভাবে রাখা যাবে? গুরু, সন্ত এবং আচার্যরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হলেও তিনি যে হিন্দু জাতি থেকে এসেছেন, সেই জাতিকেই তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন? শত্রুদের কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করা কি তাঁদের 'রাষ্ট্রধর্ম' নয়? জাতির অস্তিত্ব ছাড়া কি তাঁরা বাঁচতে পারবেন?

এই সব স্বার্থপর গুরুরা মনে করেন, তাঁদের শিষ্যরা অন্ধভাবে তাঁদের কথা শুনে চলুক, ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বলে তাঁদের পূজা করুক, অপরদিকে জাতির ভাগ্য জেহাদীরা ও ক্রুসেডপন্থীরা নির্দ্ধারণ করুক।

বেশির ভাগ 'আধ্যাত্মিক' হিন্দুরা প্রতিদিন নিজেদের অকাজে ব্যস্ত থাকছেন, কেউ এক গুরু থেকে অন্য গুরুর কাছে, কেউ টাকার সন্ধানে, কেউ উৎসবে যোগ দিতে, কেউ টি ভি সিরিয়াল দেখতে, কেউ বা ক্রিকেট খেলা দেখতে ব্যস্ত। কিন্তু তাদের ভোট দিতে যাওয়ার সময় নেই। এরা মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দর্শনের জন্য বিরাট লাইনে দাঁড়িয়েছেন, কেউ বা হুণ্ডিতে বহু টাকা ঢালছেন, কিন্তু হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছু দান দিতেও অস্বীকার করেন। তাঁরা এটা বুঝতে চেষ্টা করেন না যে, তাঁদের শত্রুরা রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের অধীন করে রাখতে এবং তারপর সনাতন হিন্দু ধর্মকে ভারতের মাটি থেকে মুছে দিতে বদ্ধ পরিকর। সাধু-সন্ত-গুরু-আচার্যেরা কি নিজেরাই তাঁদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত আছেন? তাঁদের শিষ্য-শিষ্যদের বোঝানো তো দূরের কথা! কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যখন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, আচার্য ধর্মেন্দ্র মহারাজ, আচার্য নরেন্দ্র মহারাজ, সাধবী ঋতাম্ভরা প্রমুখের মতো আচার্য ও সাধবীরা হিন্দু জাতীয়তার সম্পর্কে কথা বলেন। জেহাদী ও ক্রুসেডপন্থী থেকে আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদের সম্পর্কে সাবধান করেন। তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা তখন অন্য গুরুর কাছে চলে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সব দুর্বল নপুংসক হিন্দুরা কঠিন বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হতে ভয় পেয়ে পালিয়ে বাঁচার রাস্তা খোঁজেন। শুধু এই কারণেই বেশীর ভাগ হিন্দুরা আধ্যাত্মিক গুরুর আশ্রয় নেন, কিন্তু তারা আর এস এস বা ভি এইচ পি-র মতো

(এরপর ৪ পাতায়)

"জাতীয় চেতনা বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতার কথা ভাবা যায়? জাতি যদি একটি শরীর হয় তবে আধ্যাত্মিক ভাবনা সেই শরীরের আত্মা। এই দুটিকে পৃথক কীভাবে রাখা যাবে? গুরু, সন্ত এবং আচার্যরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হলেও তিনি যে হিন্দু জাতি থেকে এসেছেন, সেই জাতিকেই তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন? শত্রুদের কবল থেকে জাতিকে, রক্ষা করা কি তাঁদের 'রাষ্ট্রধর্ম' নয়?"

সীমান্তের পাঁচালি

গোপীনাথ দে

গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম ছাত্ররা এসে পড়াশুনা করে। এমনও জানা গেছে, বাংলাদেশের সীমান্তের কোনও বাংলাদেশী ছাত্র ও দেশে বি এ পাশ করেছে;সেও ভারত সীমান্তের পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। নিয়ম আছে, কোনও বি এ পাশ শিক্ষক যদি কোনও ছাত্রকে অষ্টম শ্রেণী পাশের সমতুল্য যোগ্যতা আছে এমন সার্টিফিকেট দেয় তবে সে এদেশের বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। এইভাবে বাংলাদেশের বহু ছাত্র এমনকী বি এ পাশ ছাত্রও এদেশের সীমান্তের বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করে, পরীক্ষা দিয়ে এদেশের মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। উদ্দেশ্য একটাই— এদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণ করা। প্রয়োজনে ওইসব ছাত্ররা হোস্টেলে থেকে, কিংবা আত্মীয়দের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে। এই ছাত্ররা অবশ্যই মুসলিম এবং এ ব্যাপারে অনেক মুসলিম সংগঠন ওইসব ছাত্রদের নানা দিক থেকে সহযোগিতা করে। ভবিষ্যতে ভারতে পাকাপোক্তভাবে বসবাস ও সুযোগ নেওয়ার এটা একটা অব্যর্থ ব্যবস্থা। ভারতের কোনও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট থাকলে কোর্টের বিচারেও সে ভারতের নাগরিক বলে প্রতিপন্ন হবে।

বাংলাদেশের সীমান্তের গ্রামগুলি থেকে গর্ভবতী মায়েরা সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের হাসপাতালগুলিতে এসে ভর্তি হয় সন্তান প্রসবের জন্য এবং সন্তান প্রসবের পরে সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যায়। ওই সার্টিফিকেটে মায়ের ঠিকানা অবশ্যই হাসপাতালের নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কোনও গ্রামের ঠিকানা লিপিবদ্ধ করানো হয়। যেহেতু হাসপাতালের ডাক্তার বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না যে রোগী এদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই করে দেখার;তাই রোগী যে ঠিকানা বলে তাই লিপিবদ্ধ করতে হয় কর্তৃপক্ষকে। এইভাবে ওই নবজাতক শিশুটির জন্য ভবিষ্যতে ভারতে এসে ভারতের নাগরিক বনে যাওয়ার পথ সুগম করে রাখা হয়। তখন যদি ওই শিশুটি সাবালক হয়ে ভারতে আসে এবং ভারতের নাগরিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তখন তাকে ভারতের নাগরিক বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ তার জন্মের সময় তার মায়ের ঠিকানা ছিল ভারতে এবং সে ভারতের হাসপাতালে জন্মেছে। তাই কোর্টের বিচারেও সে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক ছিটমহল আছে যেগুলি ভারতের এবং সেখানকার অধিবাসীরা ভারতের নাগরিক। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলগুলির বিনিময়ের আন্দোলন হয়েছে তবুও সরকারের ঘুম ভাঙেনি। ভারতের ছিটমহলগুলিতে হিন্দু আর নাই বল্লেই চলে, হিন্দুরা সব চলে এসেছে ভারতে। কিন্তু যারা আছে তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তারা ভারতের নাগরিক। আর ওইসব বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের ছিটমহলগুলিতে জমির মালিকানা আছে এটা প্রমাণ করতে পারলেই সেই ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বনে যাবেন। সেই কারণে ওইসব ছিটমহলগুলির মধ্যে জমি হস্তান্তরের জাল দলিল হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে; অবশ্যই ব্যাক-ডেটে। দলিলে সবই লেখা আছে ঠিকঠাক ভাবে শুধু যে নেবে তার নামটা আর পিতার নামটা বসিয়ে নিতে হবে। এমনকি পানের দোকানেও এইসব জাল দলিল পাওয়া যায়, কিছু টাকা খরচ করলে। এই রকম একটা জাল দলিল নিয়ে যদি কোনও মুসলমান যুবক ভারতে ঢুকে পড়ে তাহলে তার কোনও অসুবিধা হবে না ভারতে থাকার। কারণ সে দেখাবে তার ওই বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহলে জমি বাড়ি আছে অতএব সে ভারতের নাগরিক। এইভাবে একটা জাল দলিল দিয়ে কোনও মুসলমান যুবক দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসে আস্তানা গাড়ল। আবার ওই একই দাগের জাল দলিল নিয়ে অপর কোনও মুসলমান যুবক জলপাইগুড়িতে আস্তানা গাড়ল। কে কিভাবে প্রমাণ করবে এরা অনুপ্রবেশকারী বা ভারতের নাগরিক নয়?

খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার একটা দপ্তর ছিল — নাম তার "শ্রমশক্তি রপ্তানি" দপ্তর, এই দপ্তরে একজন মন্ত্রীও ছিলেন। এই দপ্তরের কাজ ছিল বাংলাদেশ থেকে বেকার মুসলিম যুবকদের পাশাপাশি বা কাছাকাছি রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকারী রূপে চালান করা। ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি রাষ্ট্রে কিছু কিছু পাথেয় দিয়ে এবং অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করতে পারে এমন নাম-ঠিকানা দিয়ে এমনকী পথ নির্দেশিকা দিয়ে পাঠিয়ে দিত। যেমন মনে করুন, একজন যুবক সে বিড়ি বাঁধতে পারে, তাকে মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানের কোনও ঠিকানা দিয়ে কিছু পাথেয় দিয়ে পাঠানো হত। আবার কোনও যুবক সে হয়তো টেলারিং-এর কাজ জানে, তাকে খিদিরপুর বা পার্ক সার্কাসের কোনও ঠিকানা দিয়ে পাঠানো হতো। এইভাবে সরকারী উদ্যোগে পরিকল্পিতভাবে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। এমনকী তারা কিভাবে কার মাধ্যমে রেশন কার্ড পেয়ে যাবে বা ভোটার লিস্টে নাম তুলে এদেশের নাগরিক বনে যাবে সেসব নির্দেশিকাও দিয়ে ওই দপ্তর তাকে সাহায্য করে। এইভাবে সীমান্তের জেলাগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ এবং জনবহুল। ফল ফলেছে হাতে-নাতে। সীমান্তের সব জেলাগুলিতে বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম সংখ্যা বাড়ছে।

অপরদিকে সীমান্তের গ্রামগুলির দোকান বাজার বাংলাদেশী ডাকাত দলের আক্রমণের মুখে সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত। সন্ধ্যার পরই হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের গ্রামগুলি অনেকাংশেই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে।

ওইসব সীমান্তের গ্রামগুলি থেকে হিন্দুরা সুযোগসুবিধা মতো ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে চলে আসছে। সরকার সংখ্যালঘু ভোটের লোভে নীরব দর্শক মাত্র। মাঝে-মধ্যে ওইসব অঞ্চলে পাকিস্তানের পতাকা উড়তেও দেখা যায়। তাই জঙ্গি অনুপ্রবেশ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত আজ অগ্নিগর্ভ।

আধ্যাত্মিকতা কি হিন্দুদের রাজনীতিবিমুখ করছে?

(৩ পাতার পর)

হিন্দু সংস্থায় যোগদান করে কাজ করতে এড়িয়ে যান।

এই ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্যই সাধারণ হিন্দুরা 'অধার্মিক শক্তির কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করেন। কারণ, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবার মতো তাঁদের কোনও মনুষ্যত্ব বা তেজস্বীতা নেই। একদিকে, কংগ্রেস দল হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক গুরুরা হিন্দু রাজনীতিকে ধ্বংস করছেন। কংগ্রেস হিন্দুদের উপদেশ দিচ্ছে, 'তোমরা হিন্দুরা নিত্য পূজা করতে থাক, ভজন ও কীর্তন করতে থাক, কিন্তু জাতির ব্যাপারে দেশের ব্যাপারে ভাববে না, নিজেদের রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলবে না। আধ্যাত্মিক গুরুরাও তাঁর শিষ্যদের এই একই উপদেশ দিয়ে চলেছেন।

এটাও সত্য যে, বিজেপি তাদের নির্বাচনী ভাষণে এবং মিডিয়ার বিতর্কিত আলোচনায় হিন্দুদের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেনি বা ধরতে অস্বীকার করেছে। তারাও বাস্তব সমস্যা উপলব্ধি করে কংগ্রেসের মতো মুসলমান ও খৃস্টান ভোটারদের নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে হিন্দুদেরও খুশী করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলমান ও খৃস্টানদের রাজনৈতিক অভিসন্ধির ফলে তারা আসলকেই (কংগ্রেস) চেয়েছিল, নকলকে (বিজেপি) নয়।

এই অবস্থার মধ্যে যদি নতুন কোনও হিন্দু রাজনৈতিক দল তৈরি হয়, বা বরুণ গান্ধী হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে আরও সোচ্চার হয়, তবে কোনও রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তে কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবিরোধী সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত বলে অভিযোগ দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হবে। এতে, হিন্দুরা ভয় পেয়ে কেউ হিন্দুত্বের নামে সংঘবদ্ধ হবে না। ভীত 'আধ্যাত্মিক মার্কা' হিন্দুরা আগের মতোই উদাসীন হয়ে থাকবে। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন হিন্দুরা যাদের জাতির বা রাষ্ট্রের প্রতি কোনও ভক্তি নেই, এরা স্লিপার সেলের মতো — এরা জেহাদী ও ক্রুসেডারদের চেয়ে কোনও অংশে কম ক্ষতিকারক নয়।

আধুনিক গুরু ও আচার্যদের 'আসুরিক' ধর্মের আসল রূপটি প্রকাশ করার মতো নৈতিক সাহস নাই। অধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রুখে দাঁড়াবার কথা বলার ও তাদের 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁরা হিন্দুদের পলায়নী মনোবৃত্তিতে সাহায্য করছেন, যাতে হিন্দুরা এসব এড়িয়ে চলেন। তাঁরা একদিকে 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্' বলছেন, কিন্তু 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' সম্পর্কে তাঁরা নীরব রয়েছেন। তাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম', কিন্তু এই কথাটা চেপে রাখছেন 'ধর্ম হিংসা তথৈব চ'। অর্থাৎ তাঁরা বলছেন অহিংসা পরম ধর্ম, কিন্তু ধর্ম রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হলে হিংসার পথ অবলম্বন করা উচিত। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসার আশ্রয় নিতে হবে — এই কথাটা তাঁরা প্রচার করছেন না। সব ধর্মই একই ভগবানের দিকে নিয়ে যায় — এই কথা প্রচার করে তাঁরা শিষ্যদের মনে অজ্ঞানতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন।

একমাত্র আলোর রেখা হচ্ছেন রামদেবজী, যিনি তাঁর শিষ্যদের ভারতমাতার পূজা করার কথা বলছেন (তাঁকে নিজেকে পূজা করার কথাও নয়) এবং ১০০ শতাংশ ভোট দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি এবং তাঁর দলের সকল সদস্যই 'আস্থা' চ্যানেলে জাতীয়তাবাদের প্রচার করছেন। যে সমস্ত গুরু এবং সাধুসন্ত দেশমাতৃকার প্রতি প্রেম না করে শুধু নিজেদের ভাবমূর্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির দিকে ব্যস্ত আছেন, তিনি এমন কী তাঁদের তিরস্কারও করেছেন। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ও আনন্দের কথা। তাঁর দল বেড়ে উঠুক। এইসব সাধু-সন্ত ও গুরুদের প্রতি বলতে হবে সোজা কথায় যে — তাঁরা যা করছেন এটা রাষ্ট্রধর্ম বিরোধী — রাজনীতি কোনও পাপ কাজ নয়, যদি একমাত্র মুসলিম ও খৃষ্টানরাই দেশের শাসক নির্দ্ধারণ করে, তবে তাঁদের ধর্মীয় সংস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাঁদের শিষ্যদের নির্দেশ দেওয়া উচিত যে, হিন্দু প্রার্থীকেই তাঁদের ভোট দিতে হবে। যদি কোনও গুরু 'সেকুলার' হতে গৌরববোধ করেন, তবে তাঁদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে — আপনি হিন্দু কি না? যদি হিন্দু হন, সেইভাবে ঘোষণা করুন। যদি না হন, তবে আপনি কী? মুসলিম, খৃস্টান, পার্শী, ইহুদী অথবা নাস্তিক? আপনি আপনার পাশপোর্টে আপনার Religion কি বলেছেন? হিন্দুদের ঘাড়ে চেপে তাঁরা ফুলে ফেঁপে উঠবেন অথচ হিন্দু নামটাকেই ঘৃণা করবেন, এটা তাঁদের করতে দেওয়া হবে না।

জাতীয়তাবোধশূন্য স্বার্থপর আধ্যাত্মিকতা একদিকে তাঁরা গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও রামরাজ্য সম্পর্কে প্রবচন দিচ্ছেন, অন্যদিক ভারতে রোম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করছেন। এটা এমন একটা 'স্বার্থপর আধ্যাত্মিকতা' যার মধ্যে কোনও জাতীয়তাবোধ নেই। এই মনোভাবই আমাদের ১০০০ বছর ধরে ক্রীতদাস করে রেখেছে। একে যদি আরও চলতে দেওয়া যায়। তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই পারে।

আজ কংগ্রেসের 'পাওয়ার অযোগ্য' এই জয়কে অভিনন্দিত করা ভুল হবে অথবা বিজেপির শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দুঃখ করাও ভুল হবে। কারণ ৬০ শতাংশ-এরও বেশী আধ্যাত্মিক হিন্দু ভোটদানে বিরত ছিলেন। সমস্ত জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের কর্তব্য হবে এই সব 'আধ্যাত্মিক মার্কা' বোকা হিন্দুদের রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন করা, যাতে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দিক থেকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হন, যাতে পরের নির্বাচনে ১০০ শতাংশ হিন্দু ভোট দিতে পারেন, তবেই জয় বা পরাজয়ের একটা অর্থ করা যাবে। একমাত্র তখনই হিন্দুর শাসন ক্ষমতা প্রকৃত হিন্দুদের হাতেই ফিরে আসবে।

পরিশেষে বলতে চাই, সমস্ত গুরু ও আচার্যদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, এমনকী তাঁরা 'হিন্দু ভয়েস'কে ঘৃণা করলেও। এঁদের মধ্যে কয়েকজন, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতাকে অনেক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে তাঁদের এই আধ্যাত্মিকতার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, ভারতের হিন্দু রাজনীতিকে তাঁরা যেন অবজ্ঞা না করেন। রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও তাঁরা যেন তাঁদের শিষ্যদের বাস্তব রাজনীতির কথা বিবেচনা করে বিচার পূর্বক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেন। এটা তাঁদের নিশ্চয়ই করা উচিত। একটি সত্যকারের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে তাঁরা যেন যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সংক্ষেপে বলি, স্বামী রামদেবজীর পথই অনুসরণ করে চলা উচিত।

(লেখক পি. দিবামুথু, 'হিন্দু ভয়েস' পত্রিকার সম্পাদক)

দুর্নীতিতে জড়ালেন

(১ পাতার পর)

এবং সীট বাড়ানোর কাজে অনুমোদনপত্র দিতে গড়িমসি করেন। প্রসঙ্গত, দেশে যেখানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাদেরকে এ আই সি টি ই-র কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে দেশের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক। কলেজের পরিকাঠামো দেখে সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু করবার অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক। তাই এই অভিযোগ যে কোনও শুভ বার্তা বহন করছে না তা বলাই বাহুল্য।

দাঙ্গার শ্রেণীবিভাগ

(১ পাতার পর)

দেশে। এক্ষেত্রে মৃত ৪৪ এবং আহত ৮২ জন। ২০০৭-এ ৮০টি হিন্দু-খৃস্টান সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় তিনজন নিহত এবং ১১০ জন আহত। ২০০৮-এ ওড়িশায় বড় আকারে খৃস্টানদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষ করে বনবাসী অধ্যুষিত কন্ধমাল জেলায়। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী'র এবং তাঁর চারজন অনুগামীকে দুষ্কৃতীরা গতবছরের ২৩ আগস্ট তাঁরই আশ্রমে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে। তার ফলে যে হিংসা ছড়ায় তাতে ৪০ জন নিহত হয়। হিংসায় ব্যাপক হারে বাড়ি-ঘর এবং ধর্মীয় স্থান ধবংস করা হয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০৮-এ ওড়িশা ছাড়াও কর্ণাটকে খৃস্টান উপাসনাস্থল আক্রান্ত হয়েছিল। ওই দুটি প্রদেশ ছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু স্থানে একইরকম ঘটনা ঘটেছে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার — হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খৃস্টান এভাবে শ্রেণীবিভাজন করে কেন্দ্র যে মুসলিম-খৃস্টান ব্লক ভোট পাওয়ার রাজনীতি করছে তা জলের মতো স্পষ্ট। তাদের উদ্দেশ্য ওই দুই সম্প্রদায়ের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে আরও কাছে টানা — ওয়াকিবহাল মহল এরকমই মনে করছেন।

সি পি এম দিশাহারা
শহীদ হতে ৩৫৬ ধারা

সক্রিয় কংগ্রেসী ক্যাডার, নিষ্ক্রিয় পুলিশ— বনধের দিন।

নিশাকর সোম।। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে অমঙ্গলের সূচনা দেখা গেল। কংগ্রেস বিধায়কদের একটি দল মঙ্গলকোটে যাচ্ছিলেন সেখানকার ঘরছাড়া কংগ্রেস-কর্মীদের অবস্থা দেখতে। কিন্তু সেই বিধায়ক দলকে চারিদিক থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে

রাজ্য রাজনীতি

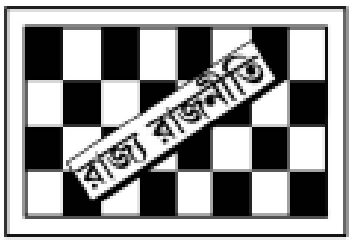

আহত করে সিপিএম-কর্মীরা। প্রসঙ্গত এই মঙ্গলকোটে সিপিএম-এর এক নেতা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় নিহত হওয়াতে অভিযোগ ওঠে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঠিক এর পরেই মঙ্গলকোটে নিহত সিপিএম-নেতার স্মরণ সভায় শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, "সিপিএম যদি ইচ্ছা করতো তবে মঙ্গলকোট বিরোধী শূন্য করে দিতে পারতো।" এর পরেই এই ঘটনা। এই ঘটনা সম্পর্কে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন — "এই ঘটনায় সিপিএম-এর জড়িত থাকার ব্যাপারে পার্টির জেলা-কমিটিকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।" তিনি অবশ্যই এই ঘটনার আগের দিনই বলেছেন প্রতিশোধ নেওয়া চলবে না। তবে এটা ঠিক যে, বর্ধমানে বিমানবাবুর কথা খাটবে না। সেখানে নিরুপম সেন-বিনয় কোঙারের লাইন চলবে। বর্ধমানে ত্রাস সৃষ্টি করে বর্ধমান জেলাকে শেষ দুর্গ হিসাবে ধরে রাখার জন্য এই হাঙ্গামা। বর্তমানে সিপিএম-এ চলেছে এক সাংগঠনিক নৈরাজ্য। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে পলিটব্যুরো থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু অচ্যুতানন্দন বলে চলেছেন তিনি পার্টির মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এর কারণটা হল কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বেশ বড় অংশ অচ্যুতানন্দন-এর পক্ষে ছিল। কারাত ইয়েচুরিদের বক্তব্য হল, "অচ্যুতানন্দন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে নির্বাচনে পার্টির ক্ষতি করেছে। এই কারণে তাঁকে পলিটব্যুরো থেকে সাসপেন্ড করা হল।" স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর রাজ্যস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে — "সুভাষ চক্রবর্তী সহস্রাধিক বার প্রকাশ্যে পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার পর তাঁকে রাজ্য সেক্রেটারিয়েটে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অচ্যুতানন্দনকে পলিটব্যুরো থেকে সাসপেন্ড করা হল। একই পার্টিতে দু'রকম নীতি কেন? সুভাষ চক্রবর্তীকে পার্টি নেতৃত্ব ভয় পায় কেন?

বর্তমানে সিপিএম রাজ্য কমিটিতে তীব্র দ্বন্দ্ব। বুদ্ধবাবু চান বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে। তিনি তাঁর মতো করে প্রশাসন চালাতে চাইছেন। কিন্তু বিমান বসু চাইছেন পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণে সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানেই বুদ্ধ-বিমান মতবিরোধ। সিপি এম-এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীতে বর্ধমান গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিমানবাবুকে সব থেকে বেশি সমর্থন করছেন গৌতম দেব। কিন্তু তিনি স্পন্ডিলাইটিস ব্যাধির জন্য পার্টি সভায় উপস্থিত হতে পারেন না।

এ কথাও উঠেছে যে জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই জ্যোতি বসু বক্তব্য রেখেছিলেন। জ্যোতি বসু একাধিকবার পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে পার পেয়ে গেছেন। এই জ্যোতি বসুকে সমালোচনা করার দরুণ প্রবীণ নেতা নৃপেন চক্রবর্তীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। জ্যোতি বসুর পুত্রকে সমালোচনা করার জন্য যতীন চক্রবর্তীকে আর এস পি বহিষ্কার করেছিল। অথচ একদিন এই যতীন চক্রবর্তী জ্যোতি বসুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন — যেন 'কিউ-ইউ' — একথা বহুজন বলতেন।

মঙ্গলকোটে কংগ্রেসী বিধায়কদের নিগ্রহের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা রাজ্যে অবরোধ, সরকারি বাস পোড়ানো এবং বিধানসভায় তোলপাড়। মঙ্গলকোটের ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুঃখপ্রকাশ এবং নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে — নিরুপম সেনকেই পরোক্ষে সমালোচনা করা হল। বিমান বসুর অবস্থা অতীব করুণ! তাঁকে বুদ্ধদেববাবু তোয়াক্কাই করেন না। এদিকে কেন্দ্রীয় কমিটি লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল পর্যালোচনায় এরাজ্যের পার্টি সংগঠনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা

(এরপর ১৫ পাতায়)

অঢে রকম

মন্দির মানব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তিনি ইচ্ছা করলে বৃদ্ধ বয়সেও ভুরি ভুরি টাকা রোজগার করতে পারতেন। বিলাস-ব্যাসনে দিনপাত করতে

দেবলাল সাহ যেন 'কাছের মানুষ'। বড় বড় কোম্পানিতে যুক্ত হলে তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতেন। কিন্তু দেবলাল সাহ ঠিক করেছেন কোনও বাজারি কাজ নয়। দেবতার কাজই করবেন শুধু। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। মন্দিরের বিভিন্ন কারুকার্য।

গ্রামের কোনও কাজ হলেই তাঁর ডাক পড়ে। গ্রামবাসীর কাছে তিনি টেম্পল ম্যান (মন্দির মানব)। তবে দেবলাল নাম যশের কাঙাল নন। তাঁর মতে, 'আমি জানি না আমাকে কে কী বলে ডাকে। মন্দিরের কাজ

দেবলাল সাহ

পারতেন। আজকের বাজারে তিনি অচল মুদ্রা নন। তাঁর পাণ্ডিত্যের মূল্য এখনও অনেক। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের দেবলাল সাহ-র জীবনধারা সত্যিই ভিন্নধর্মী। বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও জীবনকে অন্যভাবে শুরু করেছেন তিনি। লক্ষ্ণৌ-র কলেজ অফ আর্কিটেক্ট-র সহকারী অধ্যাপক ছিলেন দেবলাল সাহ। এখন অবসর নিয়েছেন। শুরু করেছেন অন্য অধ্যাপনার কাজ।

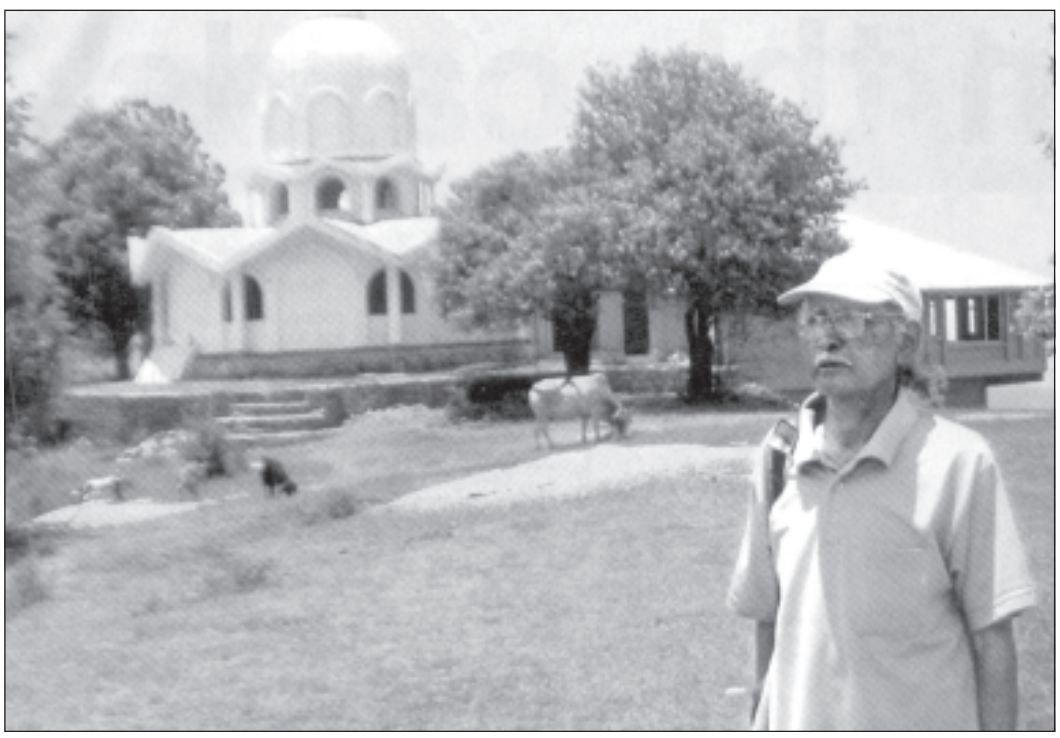

নিজের স্থাপত্যকর্মের জ্ঞানকে জনহিতে দেবসেবায় ব্যবহার করছেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ মন্দিরের স্থাপত্যকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম। নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় করে দিয়েছেন একাজে। মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছেও স্থাপত্যকীর্তির দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। নিজের মন-প্রাণ ঢেলে এসব কাজ সমাধা করেন দেবলাল বাবু। পিথোরাগড়ের বেশিরভাগ মন্দিরের স্থাপত্যের কাজ তাঁর হাতেই গড়া। মন্দির কর্তৃপক্ষও তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভরসা করতে পারেন না। পিথোরাগড় থেকে ১৪ কিমি দূরের চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরের কাজ করে তিনি তাবড় তাবড় স্থাপত্যবিদকে চমকে দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর অবসর জীবন একাজেই সার্থক। পাহাড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত চণ্ডিকা দেবীর মন্দির। মন্দিরের আশেপাশে ছিল না কোনও স্থাপত্যের কাজ। দেবলাল সাহ প্রথম গড়ে তোলেন বড় হলঘর থেকে ভোগের ঘর। যার ওপর গড়ে উঠেছে তাঁর হাতের বিভিন্ন

আমার ভালো লাগে তাই করি।'

দেবলাল সাহ-র এই গুণও অন্যের কাছে মহান করে তুলেছে তাঁকে। গ্রামের অনেক মন্দিরই তাঁর হাতের কাজে যেন আরও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। গ্রামের কামাক্ষা দেবী, পশুপতিনাথের মন্দির সহ আরও অনেক মন্দিরের স্থাপত্য কাজের পিছনে রয়েছে দেবলাল বাবুর হাত। তাঁর স্ত্রীও স্বামীর এই কাজে গর্ব করেন। বৃদ্ধ বয়সে দেবলাল বাবু তাঁর মনের কাজ খুঁজে পেয়েছেন। গ্রামের এসব কাজে তিনি টাকাও কম নেন। এমনও হয়েছে, নিজের থেকেই সব খরচপাতির যোগান দিয়েছেন। পরে কর্তৃপক্ষ পয়সা মিটিয়েছে। তাঁর এই মহানুভবতার জন্যই তিনি 'টেম্পলম্যান'।

সীমান্তে জেহাদি তৎপরতা বাড়ছে

সংবাদদাতা, মালদা ।। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে লোকসভা ভোটের পর কংগ্রেস ক্ষমতায় আসায় বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ এবং জেহাদি কার্যকলাপ বেড়ে গেছে। গত ছ'মাসে মালদহের ইংলিশবাজার ব্লকের মহদীপুর বর্ডার দিয়ে আসা প্রায় ৫৫০ জন বাংলাদেশী বাংলাদেশে আর ফিরে যায়নি। বৈধভাবে আসা এইসব বাংলাদেশীরা রাজনৈতিক দলগুলির মদতে রেশনকার্ড, ভোটার লিস্টে নাম লিখিয়ে বসবাস করছে। তাছাড়া অবৈধভাবেও দালালের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ আগের চাইতে বেড়ে চলেছে। এইসব অনুপ্রবেশকারীরাই জামাতুল ইসলাম মুজাহিদিন নামে একটি সংগঠন জেলার বেশ কিছু গ্রামে গোপনে তৈরি করেছে। বৈধভাবে আসা এই ৫৫০ জন বাংলাদেশী তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও, এদেশে থেকে যাওয়ার ঘটনা মহদীপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে গোয়েন্দা ও পুলিশকে জানালেও তারা বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করার কোনও ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেয়নি। জেলাশাসক শ্রীধর ঘোষের কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকাতে ২৮ তম ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার কো-অর্ডিনেশন কনফারেন্স থেকে ফিরে বি এস এফের প্রধান এ কে মিত্র একটি তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। তা থেকে জানা যায় ১৯৭২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ১২ লক্ষ বাংলাদেশী প্রামাণ্য নথিপত্র নিয়ে ভারতে ঢুকে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। শ্রীমিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেই এই তথ্য জানিয়েছিলেন। গত জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রায় ৫৪০০ জন বাংলাদেশী এপারে এসেছে। তারা চিকিৎসা, আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে,

মালদা

পড়াশুনা ও ব্যবসা করতে এপারে এসেছিল। তাদের মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪০ জন এখনও বাংলাদেশে ফিরে না যাওয়ায় বিষয়টি চেকপোস্ট কর্মীদের নজরে আসে। রাজনৈতিক দলগুলি এব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

মালদার বেশির ভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা-পরিষদ দখল করে আছে সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্যরা। তারা বৈধ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবেই ব্যবহার করে জনসংখ্যা হু হু করে বাড়িয়ে চলেছে। ঠিকাদারী ব্যবসা, শ্রমিক হিসাবে এই সব অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার কার্ডের ছবি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে হিন্দুদের পিছনে ফেলে ফুলে ফেঁপে উঠছে (অর্থনৈতিকভাবে)। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সুজাপুর, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর-হরিশচন্দ্রপুর, রতুয়া প্রভৃতি এলাকায় তল্লাশি চালালেই সহজে এদের চিহ্নিত করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের চাপে তারা চুপচাপ বসে থাকে।

এদিকে বাংলাদেশ ও বিহার সংলগ্ন হরিশচন্দ্রপুর ও রতুয়া এবং বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগরে জেহাদিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে বি এস এফ সূত্রে জানা গেছে। জেহাদিরা এই সব স্থানে 'স্লিপার সেল' গড়ে তুলেছে। তাদের শীর্ষ নেতারা বাংলাদেশ থেকে এসে সেই জায়গাগুলিতে এক-দু মাস থাকছে। অর্থ সংগ্রহ করছে ও নিজেদের জাল বিস্তার করছে। গত জানুয়ারি মাসে হরিশচন্দ্রপুর থেকে জেহাদি সংগঠনের লিংকম্যান সন্দেহে হাজি আখতার নামে এক ব্যক্তিকে সি আই ডি গ্রেপ্তার করে।

বি এস এফের মালদহ সেক্টরের ডি আই জি, প্রভাত সিং টোমার বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি এখানে জেহাদিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে শীঘ্রই জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।' বাস্তবে দেখা গেছে অবস্থা কিন্তু সেই তিমিরেই থেকে গেছে।

কালিয়াগঞ্জে দমকল কেন্দ্র বিশবাঁও জলে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলার কলিয়াগঞ্জ পুরসভায় দমকল কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হতে বসেছে টাকার অভাবে। অভিযোগ যে, রাজ্য সরকারের গড়িমসিতে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এটা নিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত কালিয়াগঞ্জ পুরসভা এবং কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের দাবী, কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকা হলেও আজও আগুন নেভাতে রায়গঞ্জ দমকল কেন্দ্রের ভরসাতেই থাকতে হয়। এদিকে, দমকল কেন্দ্র স্থাপনে উত্তর দিনাজপুর জেলার পূর্ত দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পূর্ত দপ্তর বলছে যে, টাকা বরাদ্দ না হলে তারা নিরুপায়। প্রায় ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মহল থেকে কালিয়াগঞ্জে দমকল কেন্দ্র স্থাপনের দাবী উঠেছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি না পাওয়ার কথা বলে সেই দাবী এড়িয়ে যায়। অতঃপর ২০০৩ সালে কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি এক একর জমি দমকল কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারকে লিখে দেয়। গত বিধানসভা ভোটের আগে দমকল মন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায় এখানে দমকল কেন্দ্র স্থাপনের জন্য শিলান্যাস করেন। এরপর সীমান্ত এলাকা উন্নয়ণ খাতের বরাদ্দ থেকে দু'দফায় মোট ৪৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা জেলা পূর্ত দপ্তরকে দেওয়াও হয়। ওই টাকায় দমকল কেন্দ্রের মূল বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। কিন্তু পূর্ত দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে যে, দমকল কেন্দ্রের এখনও প্রচুর কাজ বাকি। টাকার অভাবে কর্মীদের আবাসন, সীমানা প্রাচীর দেওয়া সহ অনেক কাজই করা যাচ্ছে না।

কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুনীল কুমার সাহা বলেন যে, প্রায় ছয় বছর হতে চলল শহরের বুকে আমরা দমকল কেন্দ্রের জন্য জমি দিলেও আজও এই কেন্দ্র চালু হল না। এখানে অনেক তেল মিল ও ডাল মিলসহ অন্যান্য ফ্যাক্টরী আছে। যা এই জেলার অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য হল, এখানে আগুন লাগলে রায়গঞ্জ থেকে দমকল ইঞ্জিন আসতে কমপক্ষে ৪০ থেকে ৫০ মিনিট সময় লাগে। দমকল ইঞ্জিন আসতে আসতে ততক্ষণে সব শেষে হয়ে যায়। বাসিন্দাদের দাবী, রাজ্য সরকারের এই মনোভাব থেকে এটা প্রমাণিত যে, মন্ত্রী শিলান্যাস করে কেবল নির্বাচনী চমক দিয়েছিলেন মাত্র। এদিকে পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান অরুণ দে সরকার বলেন যে, এই কেন্দ্রের কাজ কবে শেষ হবে কেউ জানে না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'ডু ইট নাও' শ্লোগান এখানে গর্তে ঢুকে গিয়েছে।

কলকাতায় স্বদেশী রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বাজেট আলোচনা

ইউ পি এ সরকার কৃত্রিমভাবে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস দেখাচ্ছে

এন সি দে ।। এন ডি এ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বি জে পি নেতা যশবন্ত সিন্‌হা গত ১১ জুলাই '০৯ স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে কলকাতার ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের অডিটোরিয়ামে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০০৯-১০ নিয়ে এক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। এক প্রাণবন্ত আলোচনার সূচনা করেন স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ধনপতরাম আগরওয়াল। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার উপর এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি দেখান কিভাবে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের বদলে পাইকারী বিক্রয় মূল্য সূচকের সাহায্য নিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস দেখাচ্ছে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ অভিজিৎ সেন বলেন, বাজেটে ফ্রিঞ্চ বেনিফিট ট্যাক্স তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, আসলে কিন্তু এই ট্যাক্স তোলা হয়নি। শুধু মালিকের উপর থেকে তুলে কর্মচারীদের উপর চাপানো হয়েছে।

প্রধান বক্তা হিসেবে যশবন্ত সিন্‌হা বলেন, এবারের বাজেটের প্রধান দিক হল বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ (৪ লক্ষ কোটি টাকা) নিয়ে বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা। তার মতে, এই অপরিকল্পিত ব্যয় কখনই আর্থিক উজ্জীবন প্রক্রিয়া হতে পারে না। এর ফলে প্রাথমিকভাবে লাভ হলেও হতে পারে কিন্তু এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী সুফল আসবে না। চাই উৎপাদনমুখী মূলধনী ব্যয়। অনুৎপাদক ব্যয় সুফলদায়ক নয়।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে এইরকম অপব্যয় রুখতেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার Fiscal Responsibility Budget Management (FRBM) Act চালু করেছিল।

সেমিনারে ডানদিক থেকে আর কে ব্যাস, ডি আর আগরওয়াল, যশবন্ত সিন্‌হা, সজ্জন ভজনকা ও ডঃ অভিজিৎ সেন।

এই বাজেটে আর্থিক দায়িত্বহীনতার অনেক প্রমাণ রয়েছে। বরং এই বাজেটে সংস্কার কর্মসূচীর ছিঁটেফোঁটাও নেই। এটা করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও ডি এম কে পার্টিকে তুষ্ট করার জন্য। কারণ এই দুটি দলকেই তাদের নিজ নিজ রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রী সিন্‌হা পরিষ্কার করে বলেন যে সংস্কার মানেই হল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে সরকারের লগ্নি তুলে নিয়ে দেশী বা বিদেশী ছষ্ঠড্ডঢগ্ন লগ্নির রাস্তা করে দেওয়া অর্থাৎ সরকারের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া, যাকে চলতি কথায় বলে বিলগ্নীকরণ বা disinvestment। এই সরকার বাজেটের মাত্র একদিন আগে তাদের আর্থিক সমীক্ষায় বলেছিলেন এবার তারা বিলগ্নীকরণ করে বছরে আয় করবে ২৫,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু বাজেটে দেখা গেল বিলগ্নী করবে বছরে মাত্র ১১২০ কোটি টাকা। এই সরকারে তো আর বামপন্থীরা নেই, নেই তাদের নিয়ন্ত্রিত সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী (Common Minimum Programme)। তাহলে এবার বাধা কোথায়? তৃণমূলের মতো কংগ্রেসও এখন বামপন্থীদের চেয়েও বেশী বাম হতে চাইছে।

শ্রী সিন্‌হার বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে অনেককে বলতে শোনা যায় সংস্কার মানে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার দেশী, বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়া বোঝায় তবে তা নির্ঘাত জনগণ মেনে নেবে না বুঝেই তৃণমূল কংগ্রেস, ডি এম কে, কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা সংস্কারের বিরোধিতা করে থাকে। বিজেপি এই সত্য বুঝতে অক্ষম বলেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। বাস্তবকে অস্বীকার করে রাজনৈতিক দল কখনই সফল হতে পারে না।

শ্রী সিন্‌হা আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে বাজেটের আগে মাননীয়া রাষ্ট্রপতি কথা দিয়েছিলেন এবারের বাজেটে সুইস ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তববাদী কংগ্রেস এই প্রশ্ন নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি।

প্রধান অতিথির ভাষণে স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী শিল্পপতি সজ্জন ভজনকা বাজেটের নানান দিক নিয়ে আলোচনার সাথে সথে ভারতীয় শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে তার নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

এক কথায় কলকাতার বিদগ্ধ মানুষ এদিন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলেন।

তামিলনাড়ু

ইঁটভাটার দাস-শ্রমিকদের মুক্তি দিতে উদ্যোগ নিচ্ছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ

রেড্ডি পালায়াম গ্রামে ইঁটভাটার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই শ্রমিকদের কুঁড়েঘর।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তামিলনাড়ুর ইঁটভাটার শ্রমিকদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (আই এল ও)। গত ১১ মে আই এল ও-র তরফ থেকে এর পরিপ্রেক্ষিতে 'ক্রীতদাস শ্রমিক ঃ তথ্য ও পরিসংখ্যান / দমন-পীড়ন নীতি দ্বারা শাসন করার মূল্য— আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পেশ করে। তাতে তামিলনাড়ুর ইঁটভাটা শ্রমিকদের সঙ্গে যে অমানবিক ব্যবহার করছেন মালিকরা তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "ক্রীতদাস শ্রমিকেরা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের পরিবার-পরিজন বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে নেবার স্বাধীনতাটুকুও পান না, যার মাধ্যমে তাঁরা ঋণ বা কাজের অগ্রিম পাওনাটুকুর সুবিধা পেতে পারেন।" এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তামিলনাড়ুর অধিকাংশ ইঁটভাটা শ্রমিকই সেই সমস্ত পরিবার থেকে এসেছে, যে সব পরিবারগুলি কয়েক পুরুষ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এইসব (ইঁটভাটা) কাজই করে এসেছে। একইসঙ্গে ওই রিপোর্টে সমালোচনা করা হয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারেরও। বলা হয়েছে, সরকারি অপদার্থতাতেই কয়েক পুরুষ ধরে খেটেখাওয়া ইঁটভাটা শ্রমিকরা জানতেই পারেননি যে তাঁদের উন্নতিকল্পে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আসলে, ইঁটভাটার মালিকরা একপ্রকার দালাল শ্রেণীর লোক মারফত শ্রমিকদের কাজে লাগায়। আই এল ও-র প্রকাশিত রিপোর্টে এ নিয়ে যা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা কিন্তু ভয়ঙ্কর।

রেড্ডি পালায়াম ইঁটভাটায় শ্রমিক-শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই দালালদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'মেইসট্রাইজ'। এই মেইসট্রাইজদের কাজ হল দূর দূর স্থান থেকে যেসব উদ্বাস্তু খেতমজুরেরা কাজের সন্ধানে আসে তাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে ওই দালালেরা তাদের স্বাধীনতা হরণ করে অর্থাৎ ওই ক্ষেতমজুরদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এর বিনিময়ে তারা মোটা টাকা কামিয়ে নেয় ইঁটভাটা মালিকদের কাছ থেকে।

আই এল ও-র রিপোর্টের গুঁতো খেয়ে অবশেষে হুঁশ ফিরেছে তামিলনাড়ু সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সহ আরও কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের সহযোগিতায় সরকার এই ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তামিলনাড়ুর কাঞ্চি পুরম জেলার কাট্টানগোলাথুর মহকুমায় প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এই ইঁটভাটার কাজই বংশানুক্রমে করে যেতে হবে— এই মনোভাব পাল্টাতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে তোলাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

প্রকৃতপক্ষে ইঁটভাটার মালিকদের অত্যাচার ইদানীং অসহনীয় হয়ে উঠছিল শ্রমিকদের কাছে। সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে একদা এই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। তার মধ্যে একটি ঘটনা এইরকম— ২০০৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ ভেল্লোর জেলার পালাভানসাথু গ্রামে ১৫ জন ক্রীতদাস মুক্তি পান। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা পি সালভিও মুক্ত হন। সালভি পরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন।

শ্রমিককল্যাণ অঙ্গীকারের ঘোষণাপত্র।

তিনি জানান, 'আমি ও আমার ছেলে পি কুমারাণকে ২৯ দিন ধরে একটি পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ইঁটভাটা মালিকরা বন্দী করে রাখে। কারণ, আমাদের অপরাধ আমরা কর্মক্ষেত্র থেকে পালাতে চাইছিলাম, যেহেতু অগ্রিম হিসেবে যে টাকাটা আমরা নিয়েছিলাম তা ফেরত দিতে অক্ষম। আমাদের প্রায় একমাস ধরে একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এমনকী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে হতো ওই ঘরের রক্ষীর অনুগ্রহে।"

আরেকটি ঘটনা— ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিরুভাল্লুর জেলার ওথুকোট্টাই থেকে ইরুলার উপজাতির একদল মানুষকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। ওই মুক্ত হওয়া মানুষদের মধ্যে অন্যতম মানবঙ্গল গ্রামের কে গোপী জানান, 'তাঁর হারিয়ে যাওয়া আট বছরের মেয়ের সন্ধান না দিতে পারার জন্য ইঁটভাটা মালিকের রোষে পড়েন তিনি।'

শিশুশ্রম যে দেশে গর্হিত অপরাধ, সেই দেশেরই একটি অংশে শিশু শ্রমিকদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছে। যে অত্যাচারগুলো খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে, তার প্রেক্ষিতে হয়তো ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন ওই হতদরিদ্র শ্রমিকরা। কিন্তু এর বাইরেও যে কয়েক লক্ষ শ্রমিক রয়েছেন তাদের মুক্তি দিতে উদ্যোগী হয় আই এল ও। এই কাজে তারা পাশে পেয়ে যান তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার ও ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সহ আরও কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনকে। আজকের যুগেও মধ্যযুগীয় বর্বরতা বা ক্রীতদাস প্রথা মানা যায় না। শ্রমিকদের তাই মানবাধিকার সম্পর্কে অবহিত করা ও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলাই আশু লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ও রাজ্য সরকারের।

কেরলে তরুণ নেতৃত্বের অভাব স্বীকার কারাতের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত গত ৪ জুলাই স্বীকার করে নিয়েছেন, কেরল পার্টি সংগঠনে তরুণ নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। আরও একধাপ এগিয়ে কারাত বলেছেন, নতুন যুগের কমরেডরা যাঁরা কেরলে পার্টিকে নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের 'গুণগত মানের' (lack of quality) অভাব রয়েছে। কেরলের উত্তরাংশে ভাটাকারায় দলের জোনাল কমিটির বৈঠকে প্রথমবারের জন্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দনকে পলিটব্যুরো থেকে অপসারণের পর এক প্রতিবেদন পেশ করার সময় কারাত এই কথা বলেন। ওই বৈঠকে ক্রমাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব যে দলীয় সংগঠনের যুবকদের বিভ্রান্ত করছে কারাত তা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বলেন, দলের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে উঠছে যা পার্টির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। সেই সঙ্গে আরও একটা বিষয় কারাত ইঙ্গিত করেন। তা হল — পার্টির উঁচুস্তরের নেতাদের সঙ্গে নীচুতলার যোগাযোগ ক্রমশ কমছে।

কারাতের এ হেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক মহল মনে করছে, অচ্যুতানন্দনকে পলিটব্যুরো থেকে সরিয়ে যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছেন কারাত। ছিয়াশি বছরের ভি এস অচ্যুতানন্দন শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই নন, পার্টি কর্মীদের কাছেও যথেষ্ট শ্রদ্ধেয়। অন্যদিকে কারাতপন্থী কেরলে পার্টির রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও লাভলিন বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারী থেকে তাঁর (বিজয়নের) অব্যাহতি ভালোভাবে নেয়নি সাধারণ মানুষ। উপরন্তু ভি এসের সঙ্গে বিজয়নের ঝগড়ায় সাধারণ মানুষ তো বটেই, পার্টি-কর্মীদের মনেও বিজয়ন সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বিজয়নের প্রচ্ছন্ন মদতদাতা হিসেবে নিজের দোষ খন্ডন করতেই কারাতের এরূপ বক্তব্য বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

ওই মহলের মতে, এর মাধ্যমে কারাত স্পষ্ট বোঝাতে চাইলেন, কেউ যতই জনপ্রিয় হোন না কেন, পার্টির (পড়ুন কারাতের) হুকুম না মানলে তার গলা গিলোটিনে যাওয়া অনিবার্য।

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিরোধীদের অবিশ্বাস্য ফল

পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর

অর্ণব নাগ

সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাটা হল, 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর'। কথাটা আর রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, একটু-আধটু খবরের কাগজ পড়া যে কোনও লোকের কাছেই কথাটা পরিচিত ঠেকবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধানে কথাটার অর্থ হল 'শাসকপক্ষের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার প্রবণতা' অর্থাৎ এক সরকার বেশ কিছুদিন কাজ করার পর সাধারণ নাগরিকদের মনে হয় সরকার পাল্টালে তারা হয়ত আরও ভালো কাজ করতে পারবে। এটা যে সবসময় খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য কথা এমন কিন্তু নয়। কোনও একটি সরকার, তা সে রাজ্য কিংবা কেন্দ্র যাই হোক না কেন, একাদিক্রমে দশ পনেরো বছর বেশ ভালোভাবে অতিক্রান্ত করেছে — ভারতবর্ষে এমন অভিজ্ঞতা খুব একটা দুর্লভ নয়। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসী দাপট ওই অভিজ্ঞতাকে বেশ ভালোভাবেই মানানসই করে তুলেছিল। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব মানুষের চেতনা, মননকে যত পরিচ্ছন্ন করেছে, ততই সরকার পাল্টে ফেলার একটা প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। সাতের দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পাঁচ থেকে দশবছর — এই সময়টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসকের শাসনভারকে। এক দলের সরকার পাল্টেছে, অন্য দলের সরকার এসেছে এবং আবার তা পাল্টেছে — এই পালাবদলের পালাই রাজনৈতিক বিজ্ঞানে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। যে ফ্যাক্টর কাজ করায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জয়ললিতাকে গতবার লোকসভায় একটি আসনও না পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। যে ফ্যাক্টরে কেরলে প্রতি পাঁচবছর অন্তরই ঘটে চলেছে পরিবর্তন।

এই যে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি' নিয়ে এতগুলো কথা বলা হল, তা যদি ভারতবর্ষের সামগ্রিক ভোট চিত্র হয়, তবে বলতেই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ছিল এক ভিনগ্রহের রাজ্য এবং ত্রিপুরাকেও সেই গ্রহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল! লক্ষণীয় দুটো রাজ্যেই কিন্তু কমিউনিস্ট বা বলা ভালো সিপিএম তথা বামফ্রন্টের রাজত্ব চলছে। ত্রিপুরায় সতেরো বছর আর পশ্চিমবঙ্গে তেত্রিশ বছর ধরে বাম রাজত্ব চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এক আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তের একটি কথার অনুরণন সব সময় কানে বাজে — 'I am surprised, Why anti-incumbancy does not work here!' শুধু তিনিই নন, এ রাজ্যসহ দেশজ সংবাদমাধ্যম তো বটেই, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের বিস্ময়েরও উদ্রেক করেছিল এ রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া কেন কাজ করে না তা নিয়ে। কোনও কোনও মহল থেকে এরকমও আওয়াজ উঠত, বামেরা এত ভালো কাজ করছেন যে তাদের সরানোর প্রয়োজনই অনুভব করছেন না সাধারণ মানুষ। এই মত ছিল মূলত বামপন্থী মানুষজনের। কেউ কেউ এমন মতও পোষণ করেছেন, বিরোধীদের সংগঠন-হীনতা ও রাজনৈতিক অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে বামপন্থীরা আরও বহুদিন এ রাজ্যে আসীন থাকবেন। কট্টর দক্ষিণপন্থীরা ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে এনে বলতেন, বিশ্বের যেখানেই কমিউনিস্ট শাসনের সূচনা হয়েছিল, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বহু বছর ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল এবং অবশেষে জনরোষে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের স্বপ্নের শাসন-ইমারত। সেইসব দক্ষিণপন্থীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একদিন না একদিন তাই ঘটবে।

যাই হোক, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে যে 'ট্রেন্ড'-এর সন্ধান মিলেছিল, তা অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছে সদ্য সমাপ্ত পুর-নির্বাচনে এবং সাম্প্রতিক পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে। এতদিন ব্রাত্যজনের ভূমিকায় থাকা 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' আচমকাই কাজ করতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে। যদিও এই ফ্যাক্টরটি অতীব জটিল এবং যার সম্ভাব্যতা (প্রবাবিলিটি)র অঙ্ক কষতে কালঘাম ছোটে পরিসংখ্যান-বিদদের তবুও এই প্রতিবেদকের দৃষ্টিতে তার যথাসম্ভব বর্ণনা দেওয়া যাক।

> **দীর্ঘ সিকি শতাব্দী ধরে কট্টর বামবিরোধিতার ফসল ঘরে তুলছেন মমতা। তৃণমূলের প্রাপ্ত সব ভোটই তাদের নয়। রাজ্যের নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় উন্নয়ণ এখন আর কোনও ইস্যু নয়। গুরুত্ব পাচ্ছে তেত্রিশ বছরের অপশাসন থেকে মুক্তির প্রশ্নটি। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সব ভোটই জমা পড়ছে তৃণমূলের ভাঁড়ারে, শুধুমাত্র অপশাসন থেকে মুক্তির আশায়।**

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে ১৯৭৭ সালে। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা সেইবার ছিল গোটা কুড়ি মতো। কমপক্ষে ৪৮টি আসন না থাকলে তখন কাউকে বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়ার অধিকার ছিল না স্পীকারের। এরপর '৯৬ সাল অবধি যে পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচন হয় তাতে কোনও বারই কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ছ'-এর ঘরের গন্ডী পার হয়নি। এর মধ্যে ১৯৮৭ সালে একবার কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৪৮-এর নীচে নেমে যাওয়ায় প্রধান বিরোধী দলহীন পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হয়। যার দরুণ সংবিধান সংশোধন করে প্রধান বিরোধী দলের ন্যূনতম আসন সংখ্যা ত্রিশ ধার্য করা হয়। বামবিরোধী আন্দোলনে ঝড় তোলা মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস ছাড়েন ১৯৯৭ সালে। জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি কথা বরাবরই খুব প্রচলিত। কথাটি এরকম, যে সমস্ত কংগ্রেসী রাজনীতিকরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তা নাকি স্রেফ কংগ্রেসের জন্যই। নেহেরু-গান্ধী পরিবারের জার্সিটা খুলে রাখলে তারা আবার 'পুনর্মুষিক ভব' হয়ে যাবেন। ইতিপূর্বে জরুরী অবস্থার সময় দল ছেড়ে প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি কোনওদিন কংগ্রেসে ফেরেন তবে তাঁর নামে কুকুর পুষতে পারেন। সেই প্রিয়রঞ্জনই পরে নতশিরে ফিরে আসেন কংগ্রেসে। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে মনোমালিন্যে ১৯৮৪-তে দল ছাড়েন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সারা দেশে তাঁর প্রার্থীরা নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সর্বসাকুল্যে মাত্র দশমিক দুই শতাংশ ভোট পান। পরে রাজীব গান্ধীর হাতে-পায়ে ধরে যোজনা কমিশনের ডেপুটি-চেয়ারম্যান হন প্রণব। এমতাবস্থায় মমতা নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। ১৯৯৮ সালে তাঁর নবগঠিত দল তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় ৭টি আসন পায়। ওই বছর কংগ্রেসের সবেধন নীলমণি একমাত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন গনি খান চৌধুরী, মালদা থেকে। পরের বছর ফের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮টি ও জোটসঙ্গী বিজেপি দু'টি আসন পায় এ রাজ্য থেকে। ২০০০ সালে সিপিআই নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বাম ঘাঁটি পাঁশকুড়া লোকসভার উপনির্বাচনে জিতে যায় তৃণমূল। দখল করে কলকাতা পুরবোর্ডও। রাজ্যজুড়ে হাওয়া ওঠে তৃণমূলের পক্ষে। কেশপুরের তৃণমূলী নেতা মহম্মদ রফিকের নাম ওই সময় খুব শোনা যেত। সেই সময়ের একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, 'কেশপুরই — (সিপিএমের) শেষপুর।' রাজ্যে লোকসভার মোট আসন ৪২টি, '৯৮ তে বিরোধীরা সর্বসাকুল্যে ৮টি ও '৯৯ তে ১৩টি আসন পেয়েছিল যেখানে বামফ্রন্টের আসন ওই বছরগুলিতে ছিল যথাক্রমে ৩৪ ও ২৯টি। '৯৮ ও '৯৯-এর নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ের হওয়ায় এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল, সার্বিকভাবে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি' হয়ত কাজ করেনি। কিন্তু ট্রেন্ডবলছে এটা ২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কাজ করবে। কিন্তু সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে হঠাৎই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে মমতা বিজেপিকে ছেড়ে ঘর বাঁধলেন কংগ্রেসের সঙ্গে। আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার। অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির ট্রেন্ড বুঝে সিপিএম নেতৃত্বও দীর্ঘ সাড়ে তেইশ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে আসীন জ্যোতি বসুকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যকে। যে বুদ্ধ দেব মমতার সঙ্গে 'Compete' করার তাগিদে সেই সময় চষে ফেলেন গ্রাম বাংলা, স্বপ্ন দেখান তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প থেকে উত্তরণের। যাই হোক, সেবারও কাজ করল না অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর। ৬০টি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তৃণমূলকে। এরপর ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভাগ্যে একটি আসনই জুটেছিল এবং সেটি মমতা ব্যানার্জীর। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কোনওক্রমে গোটা ত্রিশেক আসন পেয়ে আপাত বিরোধী দলের অস্তিত্ব ধরে রাখল তৃণমূল। 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি' তো তখন দূরের কথা। বামপন্থী সাফল্যের জয়জয়কারই প্রতিভাত হচ্ছিল সংবাদমাধ্যমে। সাধারণ মানুষ দুষছিলেন বিরোধীদের অনৈক্য , দুর্বল সংগঠন ও অকর্মণ্যতাকে।

কিন্তু সেই ধাঁধাটা থেকেই যাচ্ছিল। 'সরকারের বিরুদ্ধে ভোটদানের প্রবণতা' এখানে কাজ করছে না কেন? একি শুধুই বিরোধী দলগুলির সংগঠনহীনতার জন্য? শুধুই কি তাদের আকচা-আকচি ও অনৈক্যের জন্য? মমতা ব্যানার্জী নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, সিপিএমের রিগিং ও সন্ত্রাসের জন্যই নাকি বিরোধীদের এই হাল। এত বছর গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কাটানোর পর (বিশেষ করে হাসিম আব্দুল হালিম তো দীর্ঘদিন বিধানসভার স্পীকার থাকার সুবাদে তাঁর নাম কমনওয়েলথ্-এ তুলেও ফেলেছেন) অতি দক্ষিণপন্থীদের ব্যাখ্যা 'এটাই কমিউনিস্ট ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য', বড্ড খেলো ঠেকছিল।

তৃণমূল স্তরের নির্বাচন বলতে পঞ্চায়েত নির্বাচনকেই বোঝায়। ১৮টি জেলার মধ্যে ১৬টিতেই পঞ্চায়েতে অস্তিত্বহীন ছিলেন বিরোধীরা। বহরমপুরে অধীর চৌধুরী ও মালদায় গনিখানের

(এরপর ১৫ পাতায়)

চিত্রকূটের দ্রষ্টা নানাজী দেশমুখ

গ্রাম স্বরাজের কল্পনাকে বাস্তবে করে দেখালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত চিত্রকূট তাঁকেও আকর্ষণ করেছিল। ভগবানের বিচরণ ভূমিতে ঘুরতে তিনি এসেছিলেন চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু ফিরে যাননি। হয়তো ভগবানেরও তাই ইচ্ছে ছিল। থেকে গেছেন ভগবানেরই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। চল্লিশ বছর আগের চিত্রকূটের পরিস্থিতি তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল। চিত্রকূটের অনুন্নয়ণের চিত্র নানাজীকে অস্থির করে তোলে। আর ফিরে আসতে পারেননি নানাজী দেশমুখ। রাজনীতির মধ্যগগনে থেকেও অবসর নিয়েছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তাঁকে মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাতে রাজী হননি। মনে প্রাণে শপথ নিয়েছিলেন চিত্রকূটের সার্বিক উন্নয়ণের। স্বাধীনচিত্তে মনোনিবেশ করলেন সে কাজে।

তীর্থক্ষেত্র হিসাবে চিত্রকূটের নাম দেশে-বিদেশে সমান পরিচিত। অথচ এলাকার উন্নয়ণ ছিল না। গ্রামের কচিকাঁচারা জানত না রাম কে। কী মাহাত্ম্য তাঁর। গ্রামের কৃষকদের জানা ছিল না উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতি। জানা ছিল না কৃষিতে কীভাবে উন্নতি করতে হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি সবদিক দিয়েই পিছিয়ে ছিল চিত্রকূট। চল্লিশ বছর আগের এই চিত্র নাড়া দেয় নানাজীকে। শুরু করেন চিত্রকূটের সার্বিক উন্নয়ণের কাজ। গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়ণের লক্ষ্যে তিনি চিত্রকূটে প্রতিষ্ঠা করলেন দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সিটিটিউট-এর শাখা। যা বিশেষভাবে পরিচিত ডি আর আই নামে। গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়ণের দিকে তাকিয়েই গড়ে তোলা হয় ডি আর আই। ডি আর আই-এর মাধ্যমে নানাজী চেয়েছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ণ হোক, জাগ্রত হোক মানবিক মূল্যবোধ। আর চল্লিশ বছর পর তা হয়েছেও। চিত্রকূটে ডি আর আই-এর মাধ্যমে উন্নয়ণের দৃশ্য খোদ রাজ্য সরকারকেও অবাক করে। নানাজী দেশমুখ বিশ্বাস করতেন, সার্বিক বিকাশই কেবল পারে উন্নত সমাজ উপহার দিতে।

কৃষি ঃ কৃষি ক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। কৃষিক্ষেত্রের দুর্দশা মেটাতে নানাজী চিত্রকূটে কাজের শুরুর দিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের (১৯টি) কৃষকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। কীভাবে চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থায় জলের যোগান দেওয়া যায়, সেই ভাবনাতেই বসে বৈঠক। নানাজী অদ্ভুৎ উপায় বাতলালেন। চমৎকৃত হল গ্রামবাসীরা। ঠিক হল বৃষ্টির জল ধরে রাখা হবে। তার জন্য গড়ে তোলা হল জলাশয়। গ্রামবাসীরা নানাজীর উপদেশ মতো তা তৈরি করলেন। আশ্চর্যের হল, কোনও জলাশয়ই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হল না। স্থানীয় এলাকার পাথর-কুচি, নুড়িপাথর আর কাদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হল এইসব ড্যাম বা ছোট ছোট বাঁধ। অনেকেই নানাজীর এই কাজে মুচকি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, জল ধরে রাখতে পারবে না বাঁধগুলি। মে-জুন মাসের বৃষ্টির সময়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ধরে রাখা হল বৃষ্টির জল। নিন্দুকেরাও দেখলেন, বাঁধগুলিতে ১০ থেকে ১৫ ফুট উচ্চতায় বৃষ্টির জল মজুত করল চাষীরা। সারা বছর ওই জলকে জমিতে ব্যবহার করতে শিখল তারা। নানাজীর এই বুদ্ধি মত্তায় অবাক হয়েছিলেন তৎকালীন রাজনীতিবিদ্‌রাও।

কৃষি বিকাশ কেন্দ্র : চিত্রকূটের মানুষকে কৃষিতে জলের উপহার দিয়ে তিনি আগেই চাষীদের মন জয় করেছিলেন। পরবর্তী পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করলেন কৃষি বিকাশ কেন্দ্রের রূপায়ণ। অনুর্বর জমির মালিকদের ক্ষেত্রে কৃষি বিকাশ কেন্দ্র বিশেষ লাভজনক প্রমাণিত হল। এছাড়া গরীব ও সাধারণ চাষীদের এতে বিশেষ সুবিধা হল। গ্রামবাসীদের জন্য নানাজী গড়ে তুললেন 'সীড ক্লাব' (বীজ সংগ্রহশালা)। কৃষকদের উন্নতমানের বীজের সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই এই বীজ সংগ্রহশালা। ফলে চাষীরাও খুব সহজে উন্নতমানের বীজ দিয়ে চাষ আবাদ শুরু করতে পারল। ধীরে ধীরে একজন কৃষক অন্য কৃষককে তা বিতরণ করতে লাগল।

শিক্ষা : নানাজী প্রথম থেকেই ভেবেছিলেন চিত্রকূটের পড়ুয়ারা যাতে নৈতিক শিক্ষাও পায়। তারা যেন ভারতীয় পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। চিত্রকূটে তিনিই প্রথম গড়ে তুললেন সরস্বতী শিশু মন্দির। কচিকাঁচারা যাতে বড় হয়ে 'মানি মেকিং মেশিন' (টাকা রোজগারের যন্ত্র) না হয়ে ওঠে। তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা শিশু মন্দিরের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকল। কথায় আছে শিশু মন হল সাদা কাগজ। যেমন শেখানো হবে তেমনি শিখবে। নানাজী নৈতিকবোধ সম্পন্ন শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষিত করতে লাগলেন। বড় হয়ে আজ তাদের অনেকেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে নানাজী বিদ্যার্থীদের এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ভারতের ঐতিহ্য-পরম্পরাকে জানারও উপায় করে দিয়েছিলেন তিনি। ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, যোগ, সাঁতার, খেলাধুলো — সব বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে দক্ষ হয়ে উঠে। চিত্রকূটের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সুরেন্দ্র পাল বিদ্যালয় থেকে। হোস্টেলের সুবিধাযুক্ত এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা একটি পরিবারের মতোই ছিল। গুরু-পিতা-মাতা পরম্পরায় বিদ্যার্থীদের শিক্ষিত করা হতো।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পর চিত্রকূটের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার তেমন বিশেষ সুযোগ ছিল না। নানাজীই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম গ্রামীণ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। নানাজীর দ্বারা গড়ে ওঠে মহাত্মা গান্ধী চিত্রকূট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় হলেও নানাজীর নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌগোলিক ও জীববিদ্যার ওপর গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। নানাজীর মতে, সুস্থ সমাজ গঠনও বিকাশের অন্যতম অঙ্গ। যোগ, আয়ুর্বেদের ওপরেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। নানাজীর সদিচ্ছায় গড়ে ওঠে আয়ুর্বেদের ওপর বিভিন্ন গবেষণাগার। গড়ে ওঠে নন্দন-সদন। আউটডোর-এর রোগী দেখার জন্য নন্দন-সদন তৈরি করা হয়। 'যোগা সদন' যোগ শিক্ষার কেন্দ্র। এমনই একাধিক কেন্দ্র খোলা হয় বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য। চিত্রকূটের চার পাশে এসব কেন্দ্রগুলিতে এখন জোরকদমে কাজ চলছে।

চিত্রকূটের বেশিরভাগ এলাকাজুড়ে রয়েছে বড় বড় গাছ-গাছালি। সেই সঙ্গে আকাশ ঢাকা পাহাড়। এই সমস্ত পাহাড়ি

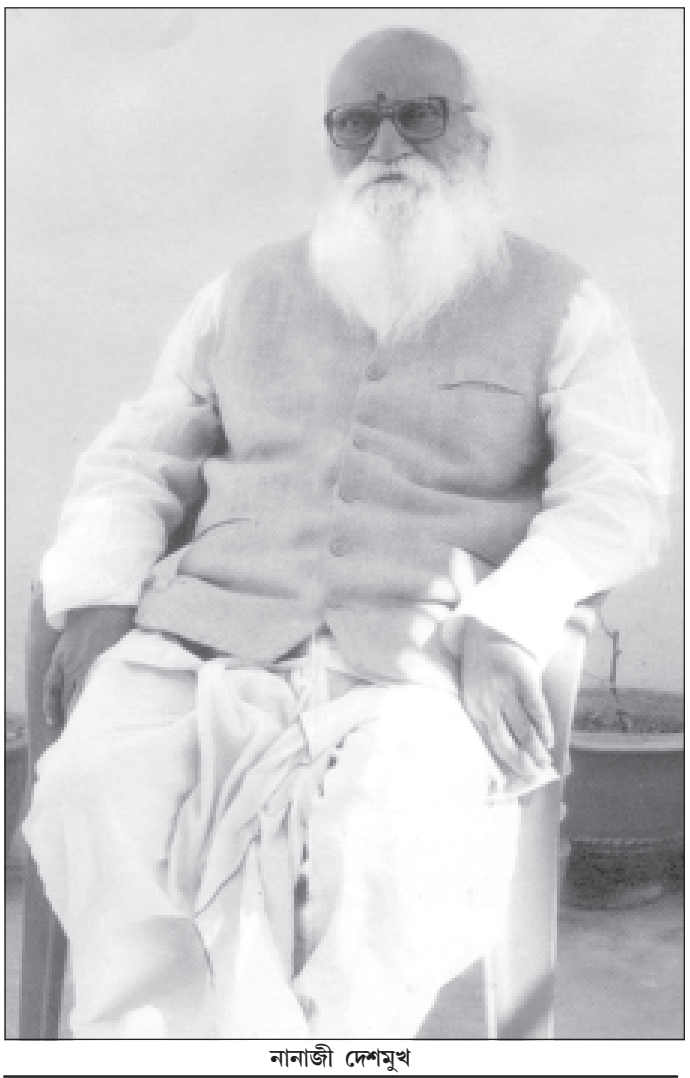

নানাজী দেশমুখ

চিত্রকূটে ডি আর আই পরিচালিত স্কুল।

গোশালা দেখছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ কালাম।

প্রকল্প দেখতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলজী।

ক্ষেত্রগুলিতে তীর্থযাত্রীদের ভিড় কম হয় না। মানসিক, আত্মিক শান্তি পেয়ে কাতারে কাতারে ভিড় জমে। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকেরা পাহাড়গুলি ঘুরেও দেখেন। কামতানাথ পাহাড় চিত্রকূটের খুব প্রসিদ্ধ পাহাড়। নানাজীর নেতৃত্বে এই পাহাড়ি এলাকার গাছ-গাছালি থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রায় ৩৪ প্রকারের ভেষজ ওষুধ পাওয়া গেছে এখান থেকে। ডি আর আই-এর মাধ্যমে এগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত ওষুধকে স্থানীয় মানুষেরা "দাদি মা কা বটুয়া' বলে থাকে।

গোশালা : নানাজীর বাস্তবোচিত পরিকল্পনার মধ্যে আর এক পরিকল্পনা হল গো-শালা। বিভিন্ন প্রজাতির গোরুকে সংরক্ষিত করা হয় গো-শালায়। গোরুর দুধের মাধ্যমে চিত্রকূটকে দুগ্ধ বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র উপহার দিয়েছেন। এমন কী অনেক লুপ্তপ্রায় প্রাণীকেও তিনি সংগ্রহশালায় ঠাঁই দিয়েছেন। গো-শালা পরোক্ষে কৃষিতে কাজে লাগছে।

উপার্জন : একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনিই চিত্রকূটকে 'পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ণে'র রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কম লগ্নিতে উপার্জনের পথও তিনি দেখান। স্থানীয় যুবক-যুবতীদের জন্য রোজগারের অভিনব পথের দিশা দিয়েছেন তিনি।

কর্মশিক্ষা : আজকে চিত্রকূট জুড়ে গজিয়ে উঠেছে প্রেসের কাজ। তরুণরা অফসেট প্রিন্টিং, স্ক্রীন প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। এছাড়াও রয়েছে তেল তৈরির মেশিন থেকে ডালের বড়ি তৈরির ব্যবসার পথ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও নানাজীর দেখানো পথে রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষা দেবার জন্য এলাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উদ্যমিতা বিদ্যাপীঠ-এ এমনই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে বিদ্যার্থীরা বাণিজ্যের বিভিন্ন কলা-কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রের চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছেন নানাজী। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র, বেকারির ব্যবসা, সাবান তৈরি, বিভিন্ন ডিটারজেন্ট

(এরপর ১৫ পাতায়)

শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী (সিপিএম) সরকার দীর্ঘদিন পরে পুনরায় জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই শিক্ষাবর্ষ, ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়ার কথা। বর্তমানে মে-এপ্রিল শিক্ষাবর্ষ চালু রয়েছে। খুশির কথা, দেরিতে হলেও সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে।

’৭৭ সালে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে চালু করেছিল ধারাবাহিক মূল্যায়ণ প্রথা। মাধ্যমিকের নবম-দশম শ্রেণী থেকেও সংস্কৃতকে তুলে দেওয়া হয়েছিল ওই সময়ে। পরিকাঠামোর অভাব ও শিক্ষকের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও রাতারাতি মাধ্যমিক স্কুলগুলির অধিকাংশকেই উন্নীত করা হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিকে। তাছাড়া পাঠ্য-পুস্তকে সুকৌশলে মার্কসবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানো, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্যাডার-রাজ কায়েম করা, শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন, মাধ্যমিক স্তরে জীবনশৈলীর নামে যৌনশিক্ষা চালু, মাসিক ইউনিট টেস্টের প্রবর্তন, শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে পাঠ্যসূচী বদল, গ্রেডপ্রথার প্রচলন, ২৫ শতাংশ নম্বরে পাশের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ছিল বাম সরকারেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার এহেন রদবদলে সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ-র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনও তারাই স্কুল শিক্ষার মূল নিয়ন্ত্রক।

স্বাধীনতার পর এ রাজ্য শিক্ষায় ছিল প্রথম ও শিল্পে ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু আজ? শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রয়েছে একাসনে। অথচ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশার স্থান আজ এ রাজ্যের উপরে। ড্রপ-আউটের ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান লাভ করেছে এ রাজ্য।

একমাত্র এবিটিএ ভিন্ন সব শিক্ষক সংগঠনই ছিল জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষের পক্ষে। তারা মে-এপ্রিল শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরানো শিক্ষাবর্ষ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) -কে পুনরায় ফিরিয়ে আনার দাবীতে বছরের পর বছর আন্দোলন করে আসছিল। সরকার নীতিগতভাবে তাদের দাবী মেনে নিলেও এবিটিএ-র বিরোধিতার কাছে তারা হার মানতে হয় বাধ্য। তবে সম্প্রতি সরকার জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালুর পক্ষে সম্মতি দিয়েছে।

রাজনৈতিকমহলের মতে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের ভরাডুবির অন্যতম কারণ যে তাদের জনবিরোধী শিক্ষানীতি তা সরকার ও শাসক দল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তাই শিক্ষাবর্ষের এই তড়িঘড়ি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। আসলে, মার্কসবাদী শিক্ষাবিদরা শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন যে ‘গিনিপিগ এক্সপেরিমেন্ট’ চালিয়েছেন তাতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে ‘গিনিপিগ’-এ পরিণত। তাদের ভবিষ্যৎ হয়েছে অন্ধকার। সুতরাং সরকারকে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। ভুলের মাশুল তাদের গুণতেই হবে। ভ্রান্তনীতির পরিবর্তন ঘটালেও শেষ রক্ষা হবে না। কারণ বিদায় বাজনা বেজে উঠেছে।

ধীরেন দেবনাথ, এ৮/১৭৫, কল্যাণী, নদীয়া।

মার্কিনী ভোগবাদ ও ভারতীয় আদর্শ

ভোগবাদ কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হলো ট্রম্পঃন্দত্তপ্পন্দক্তজন্দপ্প। এর মানে ভোগের প্রতি বাসনা। ভারতবর্ষের আদর্শ ভোগবাদ নয়। আমাদের হচ্ছে চিরন্তন ত্যাগের আদর্শ। তাই আমাদের মুনিঋষিরা বলে গেছেন “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” যার মানে হচ্ছে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। অনেকে ভাববেন সে আবার কি বস্তু, ত্যাগের দ্বারা কখনো ভোগ করা যায়? কিন্তু সমাজের জন্য ত্যাগের মাধ্যমে যে মানসিক আনন্দ উপলব্ধি করা যায় তাও হচ্ছে একধরনের ভোগ। কিন্তু এই ভোগ কলুষিত নয়, পবিত্র। প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিতে নির্দেশ ছিল যে প্রতিটি উপার্জনশীল ব্যক্তির তার মোট আয়ের দশমাংশ (১/১০ ভাগ) সমাজের জন্য দান করা কর্তব্য। এর ফলে ত্যাগের ভাবনা বাড়বে এবং সমাজের আর্থিক সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। এই নির্দেশ সবাই মেনে চললে শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণী — এই বিভেদমূলক মতবাদ বিদেশ থেকে ধার করে প্রচার করার কোনও সুযোগ থাকতো না। ভারতের রং হচ্ছে গৈরিক। গৈরিক বর্ণ হচ্ছে ত্যাগের প্রতীক। প্রভাত সূর্যের অরুণ কিরণ কিংবা যজ্ঞাগ্নির পবিত্র শিখা হচ্ছে গৈরিক। এই গৈরিক বর্ণের দিকে তাকালেই মনের মধ্যে একটা ত্যাগের ভাব আসে। তাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের বসনের রং হচ্ছে গৈরিক। ভারতের প্রতিটি মন্দিরের মাথায় এই গৈরিক বর্ণের পতাকা উড়তে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের একজন ঋষি চার্বাকও ছিলেন এই ভোগবাদের প্রবক্তা। তিনি বলেছিলেন “যাবদ্ জীবেৎ সুখ জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।” মানে যতদিন বাঁচবে আনন্দে বাঁচ। প্রয়োজন হলে ধার করেও ঘি খাবে। বর্তমান যুগে আমরা ধার করে বাড়ি করছি, ধার করে গাড়ি কিনছি, এবং ক্রেডিট কার্ড মারফৎ অসংখ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করছি। এইভাবে ভোগবাদ মানুষের মনের কামনা বাসনাকে ক্রমশ বাড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে এর পরিণতিতে হয়তো অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুঃখময় আসতে পারে। ভোগবাদের ক্রমবর্দ্ধমান বাসনা মানুষের লোভ বা লালসা প্রচণ্ড বাড়িয়ে দেয় এবং লোভের পরিণতি হচ্ছে হিংসা যা আজকের সমাজজীবনে প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিডিয়ার মাধ্যমে এখন প্রচন্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে পপ-সংস্কৃতির স্রোত। যেমন — উগ্র ও উত্তেজক নৃত্যগীত প্রভৃতি। আমরা বলেছি “সা কলা যা বিমুক্তয়ে” অর্থা‘ কলা হচ্ছে এমন জিনিস যা চিত্তের বিমুক্তি ঘটায়, মনকে শান্ত ও সংযত করে। কিন্তু পপ সংস্কৃতির ঢেউ মানুষের মনকে উত্তেজিত করছে এবং অশান্ত করে তুলছে। পোষাকের মধ্যে এমন বিবর্তন আসছে যেগুলিকে ভারতীয় সংস্কৃতির নিরীখে অনেক সময় অশালীন বলা চলে। যেমন আগেকার দিনে ভারতীয় মহিলারা শাড়ি পরত। শাড়ি একটি অতি সুসভ্য পোষাক। যা নারীর নারীত্বকে এক অপূর্ব মাধুর্য দান করে। তাই পৃথিবীতে ভারতীয় শাড়ির এখনও বিশেষ কদর রয়েছে। অনেকে বলছে যে বিশ্বায়নের যুগে এইসব পোষাক-টোষাক নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রের ধারে অসংখ্য মহিলারা ‘বিকিনি’ নামক পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায় এবং সেটিই তাদের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও ভারতীয় মহিলা যদি কোনও ভারতের সমুদ্রতটে বিকিনি পরে ঘুরে বেড়ায় তাহলে সেটাকে নিঃসন্দেহে অশালীন বা নির্লজ্জতার নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ওদের দেশে যেটা স্বাভাবিক আমাদের দেশে সেটি সম্পূর্ণ অচল। তাই শত শত লোলুপ দৃষ্টি সেই সমস্ত নারীর লজ্জাকে যেন গিলে খাচ্ছে।

ছেলেরা বর্তমানে একটি অদ্ভুত পোষাক পরছে। যার নাম হচ্ছে Cargo। প্যান্টের পায়ে তিন চারটি করে বড়ো বড়ো পকেট, তাতে বকলস এবং ফিতে ঝুলছে। দেখলে মনে হয় যেন জাহাজের খালাসি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এই পোষাক পরে নিজেদের পরম গৌরবান্বিত বলে মনে করছে। এই ধরনের বিদেশের নির্লজ্জ অনুকরণ ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতিকে ক্রমশ ভুলিয়ে দিতে চাইছে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে মার্কিনী ভোগবাদের উদাহরণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিপন্থী।

দেবাশিস লাহিড়ী, কলকাতা-৬

বানতলার সেই বীভৎস দিন

আজও আমি ভুলতে পারি না আমার ঐতিহাসিক ভুলের কথা। সুযোগ পেয়েও ১৯৯০ সালের ৩০ মে বানতলা হাটে নিহত অনীতা দেওয়ানের হাসপাতালে দেওয়া ইনজুরি রিপোর্ট, পুলিশ ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে পেয়েও তার জেরক্স কপি না রাখা আমার জীবনে নিঃসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক ভুল। কারণ তথ্য সংগ্রহে আমি ভুল করিনি, কিন্তু সেই তথ্যের মূল্য তখন বুঝিনি। ঘটনাটা একটু খুলে বলা যাক — ওই সময় আমি ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের শ্যামবাজার শাখার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ওই শাখায় অনীতা দেওয়ানের একটা জীবনবীমার পলিসি ছিল। শ্রীমতী দেওয়ানের স্বামী মনোজকুমার দেওয়ান টাকা পাওয়ার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর আমি যথারীতি আমাদের ক্লেম ফর্ম এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের একটা তালিকা সরবরাহ করি। কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীদেওয়ান আমাদের চাহিদা অনুসারে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেন। তারপর আমি প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য ঘটনাস্থল বানতলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে যাই অনুসন্ধান করার জন্য (এটা অবশ্য আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত)। প্রথমে পুলিশ অথবা গোয়েন্দা বিভাগের লোক ভেবে কেউই আমার কাছে মুখ খুলতে চায়নি। পরে আমার ভিজিটিং কার্ড এবং জীবনবীমার কাগজপত্র দেখিয়ে তাদের আস্থা অর্জন করলাম। অনেকেই সত্য ঘটনা ব্যক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের বিবৃতিতে জানা গেল ওই গাড়ি করে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা আশপাশ অঞ্চলের মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনার সুফল এবং বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে বোঝাতেন। অনেক মহিলা নিয়মিত ওই ক্যাম্পে যোগ দিত এবং ওই সুযোগ গ্রহণ করত। ওই মহিলাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন। স্বামীদের অমতে ওই ক্যাম্পে আসত, এটাই হল কাল। কিছু মৌলভি মওলানা ও মুসলিম মহিলাদের স্বামীরা শত চেষ্টা করেও তাদের ক্যাম্পে আসা থেকে বিরত করতে পারেনি। যখন মারধর এবং তালাকের ভয় দেখিয়েও কাজ হয় না। তখন ষড়যন্ত্র করেই ওই গাড়ি যাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় না আসে তার জন্য গাড়ি আক্রমণ করে। মহিলা সমাজসেবীদের প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। যেসব মুসলমান মহিলারা ওই ক্যাম্পে আসত, তাদের স্বামীরা অধিকাংশই ছিল রিকশাচালক, গাড়ি মেরামত কারখানার কর্মী, চর্মশিল্পে নিযুক্ত দিনমজুর, ঠেলাগাড়ি চালক ইত্যাদি। অধিকাংশই মদ্যপ, জুয়াড়ি। সকালে কাজে বেরিয়ে দোকানে খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফেরার আগে হাঁড়িয়া (দিশি মদ) খেয়ে যা সামান্য টাকা বাঁচত তা স্ত্রীদের হাতে দিত সংসার খরচের জন্য। আমি প্রত্যক্ষ করেছি ওইসব মহিলারা অপরিচ্ছন্ন বোরখা পরিহিতা অবস্থার ফাঁকে কোলে ৪/৫ টা অপুষ্ট বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে ভাঙা বাজারে গিয়ে সস্তায় সব জিনিস কিনে বাড়ি ফিরত। মহিলাদের চেহারায় ছিল প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর রক্তশূন্যতার ছাপ। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানতে পারলাম ড্রাইভার অবনী নাইয়া এবং অনীতা দেওয়ানের হাত-পাগুলো আখ ভাঙ্গার মতো কনুই এবং হাঁটুর দিক থেকে উল্টে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। দুই দুষ্কৃতী শ্রীমতী দেওয়ানের পা দুটো ফাঁক করে ধরার পর অন্য একজন তাঁর গোপনাঙ্গে কাঠের চেলি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এইভাবেই অনীতা দেবী এবং অবনী নাইয়ার মৃত্যু ঘটানো হয়।

এবার কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি বাংলা সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখা যাক — (১) ১৯৯০ সালের ৩০ মে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের একদল মহিলা অফিসার ও কর্মী আক্রান্ত হন। দিনের বেলায় বানতলা হাটে শত শত লোকের সামনে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে একজন মহিলা কর্মীকে গণধর্ষণ করা হয়। কুৎসিতভাবে তাঁরা দেহে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে নরপশুরা ক্ষতবিক্ষত করে। এর পর সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তিনজন মহিলাকে ধর্ষণ করার পর চলে নির্মম মারধর। গাড়ির চালক অবনী নাইয়া এবং গণধর্ষণের শিকার এক মহিলাকে পিটিয়ে খুন করা হয়। জ্যোতিবাবুর বশংবদ এক সিপিএম নেতা সমস্ত ঘটনার জন্য নির্লজ্জভাবে কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। বানতলার ঘটনা নিয়ে দু-একজন সরকারি আমলা এবং পুলিশ অফিসারের তৎপরতায় সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়েছে। রাজ্য পুলিশের তদানীন্তন ডিআইজি (সিআইডি) রাতারাতি ‘তদন্ত’ করে নিজেই সাংবাদিকদের ডেকে বলে দিলেন বানতলায় ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর জ্যোতিবাবু বলেন ‘এরকম তো কতই হয়’।

(২) ১৯৯০ সালে ৩০ মে রাত ৯টা নাগাদ পুলিশের একজন ডিআইজি তিন নারী দেহ উদ্ধার করলেন (অনীতা দেওয়ান, রেণু ঘোষ, উমা ঘোষ)। তিনি ভেবেছিলেন তিনজনই মৃত। ডিআইজি এই তিনটি দেহকে প্রায় মধ্যরাতে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে এলেন। ডিউটিতে থাকা তিনজন ডাক্তারের মধ্যে একজন মহিলা ইনটার্ণী ছিলেন। একটি নারী দেহের নিম্নাঙ্গে চোখ যেতেই সেই মহিলা ডাক্তারটি আর্তনাদ করে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। দেহটি ছিল অনীতা দেওয়ানের। ময়না তদন্তের নিয়ম হল দেহ যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, সেই অবস্থায়ই ময়না তদন্তের টেবিলে উপস্থিত করা। কিন্তু ডাক্তারবাবু ময়না তদন্তের রিপোর্টে লিখেছেন, মৃতার পরনে ছিল সদ্য পাট ভাঙা শাড়ি। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের রং ম্যাচ করা। তারপর ডাক্তারবাবু যখন ওই আবরণ মুক্ত করলেন তখন তিনি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করলেন শাড়ির নীচ থেকে প্রায় ৬/৭ ইঞ্চি জায়গায় ছোট বড় ২৩টি আঘাতের চিহ্ন। যে নারীর দেহের ওই অংশে অতগুলো ক্ষতচিহ্ন তার পরনে সদ্য পাট ভাঙা শাড়ি ও ব্লাউজের ক্রিজের দাগ এখনও বিদ্যমান, এর জন্য জ্যোতিবাবুকে জবাবদিহি করতে হয়নি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। খবরের কাগজ লিখেছিল যে তিনটি নারী দেহই নিরাবরণ ছিল।

অনীতা দেওয়ানের স্বামী একজন সিপিএম কর্মী এবং সমর্থক ছিলেন। আমি জ্যোতিবাবুর এই প্রকার মন্তব্য -‘এই রকম ঘটনা তো কতই হয়’ এবং তাঁর স্ত্রীর এইভাবে নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তিনি জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের এবং ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করলেন না। ধন্য এদের পার্টি আনুগত্য। যেদিন কাগজপত্র জমা দিলেন তার পর দিনই আমি তাঁকে চেকটা দিয়ে দিলাম। চেক নিয়ে যাওয়ার সময় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে দাবী পরিশোধ করা এবং সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে ছেলে সানজু দেওয়ানের লেখা একটা বই আমাকে উপহার দিয়ে গেলেন। বইটার নাম ‘কলকাতার কাণ্ড কারখানা’ যা আমি আজও সযত্নে অনীতা দেবীর স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ-এর জন্মদিন

গত দু’দশক ধরে স্বস্তিকা’র একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। গত ৬।৭।২০০৯ তে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শ্রদ্ধেয় ভারতকেশরীর জন্মদিনে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রত্যেক বক্তাই শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয়। শেষ বক্তা ও সভাপতি প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ তাঁর ভাষণে অনেক কথাই বললেন, কিন্তু আমি মর্মাহত হলাম যে প্রাতঃস্মরণীয় ডঃ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর কোনও বক্তব্য ছিল না। যাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এত দর্শক, শ্রোতা হাজির ছিলেন তাঁদের সামনে প্রতিটি বক্তা বক্তব্য রেখেছেন এবং ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, ওনার কথা বলেছেন। শুধু বলেননি অনুষ্ঠানের সভাপতি জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী, একটি শব্দও ডঃ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং ভবিষ্যতে এমন সভাপতির প্রয়োজন নেই বলে দাবী জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা সহ—

পি কে ঘোষ, বিধাননগর, কলি-৬৪

প্রায় দু'শো বছরের নাকাশীপাড়ার ব্রহ্মাণী মেলা

সোমনাথ নন্দী।। মানুষের জীবনে মিল আর অমিলের আবরণে সংসার। কোথাও তা ব্যষ্টিগত। কোথাও বা সমষ্টিগত। বর্তমান কালে মিলের থেকে অমিলের প্রভাবটা বোধহয় বেশি চোখে পড়ে। বাংলার জনজীবন তাই বিভক্ত হয়ে পড়েছে "আমরা-ওরা"-র ছন্দে।

তবুও মিলনের তাগিদে মেলা বসে। মানুষ আসে আনন্দের পসরা নিয়ে। ভাব-ভালোবাসার আদান-প্রদানে। তাই মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। উন্মীলন করা। যাত্রা করা — এক জায়গা থেকে যাওয়া অন্য জায়গায়। মনুষ্য সমাজে পরস্পরের পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের সংযোগ সেতু হল মেলা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন — "আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে।"

মেলার শুরু কবে? এ বিষয়ে বহুমত দেখা যায়। গবেষকদের ধারণা ব্রতকথার মাধ্যমে মেলা বা উৎসবের সূচনা। ব্রতকথার চলমানতা যেহেতু অতি প্রাচীন ও নারী জগতের লৌকিক আচারের মধ্যে উদ্ভব, এই ধারণা সেহেতু অমূলক বলা যায় না। মেলা হিসাবে এদেশে প্রাচীন মেলা হল হরিদ্বারের মেলা (কুম্ভমেলা), তারপর হস্তিমঙ্গল, পক্ষী উৎসব, জলোৎসব প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসব তথা মেলা। সাপ তথা নাগকে নিয়ে মেলাকে অবশ্যই সুপ্রাচীন বলা যেতে পারে। বিশেষত মানুষের মধ্যে যখন থেকে সর্পভীতি জেগেছে। ভারতের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এমন কোনও স্থান নেই, অঞ্চল নেই যেখানে নাগপূজা হয় না। হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য উপত্যকায় এখনও দেখা যায় হাজার-বারোশ বছরের নাগদেব ও তার মন্দির। দাক্ষিণাত্যে তো এর প্রভাব আরও বেশি। কেরলের বহু বাড়ীর অঙ্গনের এক কোনে সর্পাবাস করে রাখা হয়।

বাংলা জল-জঙ্গল অধ্যুষিত হওয়ায়, নাগপূজার থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখতে পারেনি। বাংলায় সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে আরাধ্যা মনসা দেবী। সর্পদংশন হতে বাঁচার জন্যই পূজা তাঁর। গ্রামাঞ্চলে মনসা পূজার ব্যাপ্তি তাই বেশি। অনেক স্থানে পূজা ঘিরে মেলাও বসে। সময়কাল দশহরা, নাগপঞ্চমী ও অনন্ত চতুর্দশী।

উৎসব - পালা - পার্বন

পশ্চিমবাংলায় যে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামের। কোথাও মনসা, কোথাও ব্রহ্মাণী বা বিষহরি। কোথাও পদ্মাদেবী বা ঠাকুরাণী। প্রখ্যাত সর্প গবেষক বিকাশকান্তি সাহা পশ্চিমবঙ্গে সর্প মেলার যে তালিকা তৈরি করেছেন তার মধ্যে প্রধান পনেরোটি। উত্তর ২৪ পরগনার নাকাশীপাড়ার ব্রহ্মাণী মেলা তার মধ্যে অন্যতম।

নাকাশীপাড়ায় প্রায় ২০০ বছর ধরে চলেছে নাগপঞ্চমী উপলক্ষে ব্রহ্মাণী মেলা। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী শাস্ত্রানুসরে নাগপঞ্চমী নির্দেশিত হওয়ায়, সর্পপূজা ও বহু সর্পমেলা এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নাকাশীপাড়ার মেলাটির সূচনা ১২২৫ বঙ্গাব্দে। প্রবর্তক তথাকার জমিদার ডোমনচন্দ্র সিংহরায়। বাংলার আর পাঁচটা মেলার মতো দেখা যায় দেবতার মহিমা প্রকাশ। অভিজ্ঞতার অংশীদার কোনও জমিদার বা বিত্তশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি।

জমিদার ডোমন সিংহরায় একদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ব্রহ্মাণীতলা (মনসাতলা) দিয়ে যাবার সময় তার চোখে পড়ে অদ্ভুত দৃশ্য — ব্রহ্মাণীতলার সংলগ্ন একটি প্রাচীন বটগাছ থেকে পরমা সুন্দরী এক সধবা মহিলা নেমে এলেন। এগিয়ে গেলেন কাছেই একটি পুকুরের দিকে। তারপর পুকুরের জলের ওপর দিয়ে মাঝ বরাবর হেঁটে হঠাৎ অদৃশ্য হলেন।

হতবাক জমিদার। ভাবতে লাগলেন — কে ইনি? মানবী না দেবী। উত্তর পেলেন সেদিন স্বপ্নে। দেবী তাঁকে দেখা দিয়ে বলছেন — আমি বিষহরি দেবী মনসা। তোর জমিদারিতে প্রচলন কর আমার পূজা। এতে তোর ও তোর প্রজাদের মঙ্গল হবে। ব্রহ্মাণীতলায় যে বটগাছতলা আছে সেখানেই পূজা করবি আমাকে।

নিদ্রাভঙ্গ হতেই ডোমনচন্দ্র কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী অর্থাৎ নাগপঞ্চমীর দিন উক্ত বটতলায় মা মনসার মৃৎ প্রতিমা স্থাপন করে শুরু করলেন নাগপঞ্চমীর পূজা।

গ্রাম বাংলায় যে কোনও পূজা বা ছোটখাটো উৎসবকে ঘিরে মেলা বসা দীর্ঘকালের চল। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মায়ের মহিমা বাড়ে যত, মেলার কলেবর বাড়ে তত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে মায়ের টানে, মেলার স্থানে। ভক্তদের মানত পূরণ আবশ্যিক অঙ্গ দেখা যায়।

দীর্ঘ ১৯৫ বছর পার হলেও নাকাশীপাড়ার নাগপঞ্চমী মেলায় জনসমাগমে কোনওদিন ভাটার টান দেখা যায়নি। পক্ষকালের মেলা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মাথায় করে আনেন কারুকার্য সমন্বিত জোড়া সাপ খোদাই করা মনসা ঘট। অনেকে আনেন বাঁশ ও রঙ- বেরঙের কাগজ ও রাংতায় বানানো লক্ষ্মীন্দর ভেলা। আনেন পূজার উপকরণ হিসাবে। শোভাযাত্রা সহকারে।

শ্রাবণ মাসের এই নাগপঞ্চমীতে নাগপূজা আর প্রতিমাতে হয় না। বটগাছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পূজা হয়। তাই অনেকে বলেন 'গাছ পূজা'। অবশ্য বর্তমানে রাজ্য সরকার ঘোষিত অরণ্য সপ্তাহ পালনে এই পূজাকে অপাংক্তেয় বলা যায় না।

নিয়মানুসারে সংক্রান্তির দিন পূজার প্রথম অধিকার নাকাশীপাড়ার সিংহরায় বংশের। তারপর ভক্তদের পালা। সেদিন বলিও হয় প্রচুর।

এই পূজার অন্য বৈশিষ্ট্য হল, নাকাশীপাড়ার লাগোয়া ১০/১২টি গ্রামের মানুষ পূজার দিন পালন করেন অরন্ধন ব্রত। অর্থাৎ আগের দিনের রান্না করা খাবার তারা পূজার দিন গ্রহণ করেন। প্রায় ২০০ বছরের উপান্তে এসেও প্রথাটি আজও সমানভাবে বহমান।

পূজা উপলক্ষে যে মেলা চলে তাকে পূর্বে স্বদেশী মেলা বলা হলেও বর্তমানে ভোগসর্বস্ব উপকরণ তাকে গ্রাস করে চলেছে। হারিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় কাঠ লোহার আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, কৃষিকাজের সাবেক যন্ত্রপাতি, স্থান নিচ্ছে প্লাস্টিক, স্টেনলেস স্টিল, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ। অবশ্য আছে পুতুল নাচ, নাগরদোলা, যাত্রাগান। আছে গাছের চারা ও কৃষি বীজ হরেক রকমের। উদ্যোক্তারা বলেন যদিও সে জৌলুষ কি আছে আর, বাস্তব বলে তাহলে কেন এত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি জনসমাগমের। সে কী মেলার টানে না ঐতিহ্যের আকর্ষণে?

আমাদের ভাবধারা

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

চৈতালী চন্দ।। জীবনের সব ক্ষেত্রে মানুষের আন্তরিক শক্তি প্রয়োজন যা তাকে এগোতে সাহায্য করে। এই শক্তি আসে ধ্যান বা প্রার্থনা থেকে। অর্থাৎ ধৈর্য্যের প্রথম সোপানই প্রার্থনা। প্রার্থনা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করার জন্য হাত বড়িয়ে দেন, কিন্তু ভক্তি ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে আমরা সেই হাত ধরতে পারি না। ঈশ্বর বলেন "আমি তো তোমার কাছে — বারবার এসেছি কিন্তু তুমি তো তোমার হৃদয়ে আমার বসার জায়গা রাখোনি? তোমার হৃদয় তো জাগতিক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি এসেও ফিরে গেছি।

আত্মা যখন শান্ত হয় তখনই ঈশ্বর তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন। এজন্য বলা হয় "When mind is silenced, God whispers to the ear." বেঁচে থাকতে গেলে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের দরকার, তেমনি আত্মিক-অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রয়োজন। আমাদের মনের যে তার ছিঁড়ে গেছে, তাকে আমরা প্রার্থনার দ্বারাই Power House (God)-এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি।

প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি। তাঁর সুন্দর দৃষ্টি আমরা অনুভব করি। তখন অন্তর থেকে উৎসারিত হয় —

"প্রভু, কি অপূর্ব তোমার দৃষ্টি
দেয় অমৃতবৃষ্টি
আমরা একই স্রষ্টা সৃষ্টি"

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ধ্যান শিখি, নীলাকাশের মধ্য দিয়ে আমরা উড়ে চলি, পেরিয়ে যাই সূর্য চন্দ্রের জগৎ — এক অজানা রক্তিম পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছায়। যেখানে আছে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ।

এই আনন্দ ধ্যান বা প্রার্থনা না করলে আসে না। প্রার্থনার সময় শরীর ও মন একই সুরে বেজে ওঠে, ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারি। জানতে পারি আমার মনের মধ্যে কি চলছে — "অপরের প্রতি ঈর্ষা? বদলা নেবার ভাবনা?" নিজের দোষ ত্রুটি জানলে তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে পারি। মনের অজান্তে হয়তো কখনও

কাউকে আমার বাক্য দ্বারা, আমার কর্ম দ্বারা দুঃখ দিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ক্ষমা চাইতে পারি। ধ্যান বা প্রার্থনার দ্বারা মন শান্ত হয়। মন শুদ্ধ হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ধৈর্য্য বাড়ে, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ বিপদ সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি। মানসিক অবসাদ দূর হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন — "ঈশ্বর প্রার্থনা আমায় রক্ষা করেছে। প্রার্থনা বাদ দিয়ে এই জীবন আমার কাছে নীরস আর শূন্য। প্রার্থনার কারণে রাজনৈতিক আশা-নিরাশার মেঘে আমি ঘিরে থাকা সত্ত্বেও আমার ভিতরের শক্তি কমেনি।"

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আসে আত্মসমর্পণ, তখনই আমরা বলতে শিখবো "প্রভু আমার যা কিছু সবই তোমার"। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনই বলতে পারব — "আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি। আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী;সব দিতে হবে।

তবে এক্ষেত্রে প্রার্থনা কখনই হবে না অর্থহীন মন্ত্রপাঠ বা জপতপ। ঈশ্বর দেবতা নন। তাই দেবতাদের মতো কোনও মূর্তি তাঁর নেই। তিনি নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা রূপ দিই। যখন সামনে আমরা মূর্তি আনবো, তখন তার মধ্যেই আমাদের মন স্থির হয়ে যাবে। তার থেকে ওপরে আমরা উঠতে পারবো না, কিন্তু প্রার্থনা বা ধ্যান মানে কিছুক্ষণের জন্য নিজের ঘরে-ফেরা। প্রতিদিন অন্তত একবারও আমাদের নিজেদের ঘরে ফেরা দরকার। গীতাতে এজন্য 'মন মনী ভব' মন্ত্রর উল্লেখ অর্থাৎ মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করো। স্বামী বিবেকানন্দ কল্পনা করেছিলেন একটি সার্বজনীন উপাসনা গৃহ, যেখানে কোনও বিগ্রহ থাকবে না। থাকবে 'ওঁ' প্রতীক। আজও কন্যাকুমারীতে এই ধরনের উপাসনা গৃহ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না হলে ভক্তি আসে না। ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। আমরা দেবতাদের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজি। জ্ঞান না থাকলে ভক্তি আসে না। ঈশ্বরের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"তুমি আমাদের পিতা তোমায়
পিতা বলে যেন জানি তোমায়
নত হয়ে যেন মানি তুমি
কোর না কোর না রোষ"।

প্রার্থনা হবে আন্তরিক। এখানে স্বার্থপরতার ছোঁয়া থাকবে না। সকলের জন্য চাইবো, তখন সকলের মধ্যে আমিও পড়বো। প্রার্থনা হল ভাবের আদান-প্রদান, নিজেকে উজাড় করে দেওয়া ঘরের দরজা বন্ধ করে মনের দরজা খুলে দেবো, শান্ত সুন্দর পরিবেশে প্রভুর সঙ্গে বিচরণ করে শান্তি অনুভব করব। তবে এই ধ্যান বা প্রার্থনার জন্য গৃহত্যাগের কোনও প্রয়োজন নেই। আজ পর্যন্ত যত ব্রহ্মচারী, যোগী ঈশ্বর ভক্ত হয়েছেন তাঁরা সকলেই গৃহস্থী। জাগতিক ঐশ্বর্য্য আমাদের সুখ দিলেও শান্তি দেয় না। যে শান্তির সন্ধানে মানুষ যুগ যুগ ধরে ছুটে চলেছে, তা আমরা প্রার্থনা বা ধ্যানের মাধ্যমে সহজেই করায়ত্ত করব।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা

সংবাদদাতা ।। ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত প্রত্যেক ইংরাজী মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত অর্গানন অব মেডিসিনের ক্লাসে হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র এমনকী অনুরাগীগণও যোগদান করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের সূত্রে জানা গেছে এই বিষয়ে শিক্ষাদান "কেশব ভবন'-এ (৯এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬) আয়োজন করা হবে। আগ্রহীগণ বিস্তারিত বিবরণের জন্য উক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৮৩১৭১০৭৮৮, ৯৮৩১৪৯১৬৫৮, ৯৪৩৩৮২০১৮৫ এবং ৯৪৩২২১৩৭৯০ ফোন নং -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বোধ কথা

কর্মই সাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গৌতম বুদ্ধ প্রবচন দিচ্ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ভক্তদের ভিড়। ভক্তির পরিবেশে মোহিত ভক্তরা। মনযোগসহকারে সে সব কথা শুনছেন অবাল বৃদ্ধ -বনিতা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ভক্তদের ভিড় জমেছে। মনুষ্য জীবনের ওপর প্রবচন রাখছেন ভগবান বুদ্ধ। হঠাৎ এক রাজা উঠে দাঁড়ালেন। সকলে অবাক, কেউ কোনও কথা বললেন না। রাজা বললেন, 'মহারাজ, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মানুষ চার প্রকারের অর্থ কী? দয়াকরে খুলে বলুন আমায়। চার প্রকারের মানুষ কেন, কি তাদের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ দেব হাসলেন। বসতে বললেন রাজাকে। অন্যরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল এর ব্যাখ্যা শুনতে।

বুদ্ধ দেব বললেন শোন, এই জগতে চার প্রকারের মানুষ দেখা যায়। তাদের আচার-আচরণও হয় ভিন্ন। এক, যারা অন্ধকার থেকে শুধু অন্ধকারে এগোতে থাকে। দুই, যারা অন্ধকার জীবন থেকে আলোর দিকে ধাবিত হয়। তিন, এমন মানুষও হয়, যারা আলোকিত জীবন থেকে অন্ধকারে প্রবেশ করতে থাকে। চার, আর এক প্রকারের মানুষ, যারা আলোকিত থেকে আরও আলোকময় জীবনে প্রবেশ করে। ভক্তরা একযোগে

আত্মস্থ করছিল এসব কথা। ভক্তদের জানার পিপাসা তখনও পুরোপুরি মেটেনি। আরও জানতে চায় তারা। সবার চোখে মুখে ঔৎসুক্যের ছাপ।

বুদ্ধ দেব আরও গভীর ব্যাখ্যায় প্রবেশ করলেন। বললেন, যদি কেউ চন্ডাল, নিষাদ-এর মতো নীচ কুলে জন্মে নিজে ভালো কাজ না করে, শুধু দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব নয়। সে নিম্ন থেকে আরও নিম্নতর জীবনে প্রবেশ করবে। আবার হীন জাতির হয়েও বড় হওয়া যায়। নিম্ন কুলে জন্মেও যদি ভালো আচরণ করে, নিজের বদভ্যাস পাল্টায়, তাহলে তার জীবনধারা তিমির থেকে জ্যোতির্ময়ের দিকে যেতে শুরু করে।

আবার যদি কোনও মানুষের জন্ম অভিজাত কুলে এবং রূপবান, বলবান হয়েও কথায় ও কাজে দুরাচারী হয়, সর্বদা অপরের মন্দ চিন্তা করে, কুকর্মে লিপ্ত হয়, তার জীবন আলো থেকে ক্রমশ অন্ধকার হতে থাকবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে, নিজের আচার-ব্যবহার কর্মে আরও উন্নতি করে, সে ক্রমশ আলোক থেকে আলোকিত জীবনে প্রবেশ করবে।

ভক্তরা মুগ্ধ হল ভগবানের ব্যাখ্যায়। রাজাও মনে মনে বুঝলেন কর্ম-র দ্বারাই লাভ করা যায় প্রকৃত মানব-জীবন। নীচকুলে জন্ম হলেও, লাভ করা যায় উচ্চকুলের মর্যাদা। হয়ে ওঠা যায় আদর্শ মানুষ।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

বুদ্ধি বাড়ানোর টনিক

অঙ্ক মিলছেনা? মাথা খুলছেনা? উপায় কী? ব্রাহ্মী শাকের রস? বুদ্ধি বাড়ানোর টনিক হিসেবে চকলেটকেই বেছেছেন ইংল্যান্ডের নর্দাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড কেনেডি। কারণ, চকলেটের মধ্যে থাকে পলিফেনল বর্গের রাসায়নিক, যা মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয়। মগজের ক্ষমতা বেড়ে যায়। তবে এখনই একগাদা চকলেট খেয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ডাক্তারের পরামর্শও নিতে হবে।

হাঁটুর কোমলাস্থি নিরাময়ে কোলাজেন

বৃটেনে খেলাধুলো বা শরীর চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এরকম প্রতি বছর ৮০ হাজার মানুষ হাঁটুর মিনিস্কাল কার্টিলেজ ছিঁড়ে সমস্যায় ভোগেন। এই কার্টিলেজ বা হাঁটুর কোমলাস্থির উপরের ও নীচের হাড়গুলোর মধ্যে 'শক আব্‌জর্বি কুশন' হিসেবে কাজ করে। এই সমস্যার সমাধানে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা রোগীর অস্থিমজ্জা থেকে নেওয়া স্টেম সেল দিয়ে কার্টিলেজ দ্রুত সারিয়ে তুলছেন। স্টেম সেল ও কোলাজেন (এক ধরনের প্রোটিন) থেকে স্পঞ্জের মতো একটি আবরণ তৈরি করে বিজ্ঞানীরা বসিয়ে দিচ্ছেন কার্টিলেজের ছিন্ন অংশে। ফলে ছেঁড়া অংশটিকে দ্রুত নিরাময় করে তোলে।

সারমেয়ও সংবেদনশীল

মানুষের প্রিয় বন্ধু, অতি-বিশ্বাসী, পোষ মানে তাড়াতাড়ি, চোর ধরতেও এদের জুড়ি নেই। এসবের সঙ্গে আরও একটি বিশেষণ পাচ্ছে সারমেয়কুল। এদের তুখোড় সংবেদনশীলতা। বুদাপেস্টে আয়োজিত ক্যানাইন সায়েন্স ফোরাম-এ পশু বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী সব প্রজাতির কুকুর কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা বুঝতে মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়।

চা খান ক্যান্সার কমান

কালো চা খেলে দূরে থাকবে মেয়েদের ওভারিয়ান ক্যানসার। এই তথ্য পাওয়া গেল গায়নোকোলজিক্যাল ক্যান্সার সংক্রান্ত একটি নামী ইউ এস মেডিকেল জার্নালে। অন্তত দু'কাপ কালো চা কমিয়ে দিতে পারে ৩০ শতাংশ ওভারিয়ান ক্যান্সারের সম্ভাবনা। কারণ, কালো চা-এ এমন কি শক্তিশালী এবং কার্যকর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যা রক্তের কোষগুলোর ক্রিয়াশীলতাকে উন্নত করে এবং বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। যাঁরা লিকার চা খান না, তাঁদের তুলনায় যাঁরা সারাদিনে অন্ততপক্ষে দুই বা তার বেশিবার লিকার চা খান তাঁদের এই দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা অন্তত ৪৬ শতাংশ কমতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

কিডনি রক্ষা করে মটরশুঁটি

মটরশুঁটি কমাতে পারে উচ্চরক্তচাপ এবং কিড্‌নির অসুখ। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব্‌ মানিটোবার ফুড কেমিস্ট ডঃ রোতিমির মতে, যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ বা কিড্‌নির অসুখ আছে, মটরশুঁটির প্রোটিন তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে এবং কিডনিরও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

দিদি — আমি যখন গান করি, তুই তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস কেন?

বোন — আমি যে গাইছি না সেটা পাড়ার লোককে জানাতে।

☺ ☺ ☺

শিক্ষক — ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বলতেন, আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই। এ থেকে কী শিখলে?

ছাত্র — তার মানে, ডিকশনারি কিনলে ভাল করে চেক করে নেওয়া উচিত।

☺ ☺ ☺

সুখেন — দাম্পত্য-জীবন কখন সুখের হয় বলতো?

দীপেন — স্বামী যখন কালা, আর স্ত্রী যখন অন্ধ হয়।

☺ ☺ ☺

মা — উঃ আর পারি না! দেশলাইয়ের একটা কাঠিও জ্বলছে না।

ছেলে — সে কী! সকালে আমি যে সবকটা কাঠি জ্বালিয়ে দেখলাম।

☺ ☺ ☺

প্রশ্ন — কোন্ পিঁপড়ে অঙ্কে ভাল?

উত্তর — Accountant

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। কোন্ কৌরব মহাভারতের যুদ্ধ শুরুর আগেই পান্ডব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন?

২। ওয়েলিংটন কোন্ দেশের রাজধানী?

৩। কার নেতৃত্বে একটি ভারতীয় দল ১৯ বার এভারেস্ট জয় করে পর্বতারোহন রেকর্ড সৃষ্টি করে?

৪। মানব-শরীরের একমাত্র কোন্ অংশে রক্তবাহিত হয়ে অক্সিজেন পৌঁছয় না?

৫। ১৯৭৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের প্রতীক হিসেবে একটি ফুলকে জাতীয় ফুল ঘোষণা করা হয়েছিল? কী ফুল — গোলাপ/পদ্ম/কমল?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। জুজুৎসু
২। নিউজিল্যান্ড
৩। নেপালি আপা শেরপা
৪। চোখের কর্ণিয়ায়
৫। কমল

শ্রীলঙ্কার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির সংঘাত

ডঃ জয় দুবাসী

ইংল্যান্ডের টিউডার রাজবংশীয় রাজা অষ্টম হেনরীর সম্বন্ধে একটি কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে তিনি ও তাঁর স্ত্রীদের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে তিনিই একাকী দুর্ভাগা। কারণ, তাঁর (অষ্টম হেনরী) কাছে তাদের (অষ্টম হেনরীর স্ত্রীদের) গর্দানগুলো ছিল, যেগুলোকে একের পর এক ঘ্যাচাং করে কাটার হুকুম দেওয়া হতো, কিন্তু এর জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখপ্রকাশের কোনও বালাই ছিল না রাজা হেনরীর।

সম্পর্কের এই মদগর্বী ক্ষমতায়নের চিত্রটা একইভাবে প্রযোজ্য ক্ষমতার বড় ও

যাদের জন্য লঙ্কাকাণ্ড সেই শ্রীলঙ্কা সেনারা যুদ্ধের মহড়ায়।

ছোট কেন্দ্রবিন্দুগুলির মধ্যে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা পরস্পর মিলিতভাবে অগ্রসর হয়, বিশেষ করে যেখানে তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আমেরিকা খুব কম ক্ষেত্রে, তার থেকে ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীর সঙ্গে হাত মেলায়, এমনকী মেক্সিকোর মতো বৃহৎ প্রতিবেশীকেও পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না তারা। স্ট্যালিন তার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে একটা সময় খুব হতাশ হয়ে পড়েন। কম করেও সেই প্রতিবেশীদের সংখ্যা অন্তত গোটা বারো তো হবেই। অতপর তিনি সেইসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে একসাথে সংযোজন করেন এবং তাদের সরকারের ওপর নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। প্রতিবেশীদের নিয়ে একই সমস্যা ভোগ করতে হচ্ছে বৃহৎ ক্ষমতাকেন্দ্র চীনকে। কিন্তু আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। সেই সময়টা চলে গেছে, যে সময় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আপনার প্রতিবেশীর সমস্যাকে নিরসন করতে পারতেন। এখন আর তা সম্ভব নয়। আপনি এখন কেবল দূর থেকে ভ্যাংচাতে পারেন অথবা নীরবে সহ্য করে যেতে হবে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল ভারত। আমরা কখনও আমাদের ক্ষমতা জাহির করি না এবং যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে করি, এমনকী তাদের প্ররোচনা দান সত্ত্বেও। সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আমরা এক সময়ে একটা অন্য চরমপন্থা নিয়েছিলাম। আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নয়। এবং তার মূল্য আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই চোকাতে হয়েছিল। (লেখক ১৯৯০-৯১ সালে ভারত সরকারের শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষা বাহিনী (IPKF) পাঠানোর কথা বলতে চেয়েছেন।)

বহু বছরের অভিজ্ঞতায় একটা জিনিস খুব পরিষ্কার, এলটিটিই-র অস্ত্র হাতে তুলে নেবার বহু আগে থেকেই শ্রীলঙ্কার তামিলরা সে দেশে খুব একটা সুখে ছিলেন না যদিও শ্রীলঙ্কার জনগণের একটা বড় অংশই হল তামিল। টেকনিক্যালি তামিলরা সেদেশের পূর্ণমাত্রায় নাগরিক এবং তাত্ত্বিকভাবে তারা (শ্রীলঙ্কার তামিলরা) সিংহলীদের সঙ্গে সমানিধাকার এবং বিশেষ সুবিধে (Privilege) পাওয়ার দাবী করতেই পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সিংহলীরা তাদেরকে এতদিন পর্যন্ত দাবিয়েই রেখেছে এবং তামিলদেরকে কখনই যথেষ্ট সম্মান দেয়নি। এই ঘটনাগুলোই একটা সময় বিষময় হয়ে ওঠে এবং অবহেলিত তামিলদের ক্ষিপ্ত ক্রোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটেছে এবং একইসাথে শ্রীলঙ্কাতেও সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এটা কাউকে বিশ্বাস করানো মুশকিল যে বিগত তিন দশক ধরে শ্রীলঙ্কায় যে তামিল বিদ্রোহ চলছে, তার সূচনা হয়েছিল একটা ছোট্ট দাঙ্গার মাধ্যমে, যা আজ পুরোদমে যুদ্ধের আকার নিয়েছে।

ভারত এবং ভারতীয়দের ওপর শ্রীলঙ্কানদের একটি বিজাতীয় রাগ রয়েছে। এর কারণ অবশ্যই ভারতের আয়তন যা খুবই বৃহৎ এবং তা থাকার পক্ষে যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক। লন্ডনে থাকাকালীন আমার একজন সিংহলী রুমমেট ছিলেন। তিনি একটি শুঁড়িখানায় গিয়ে বসতেন। আমি তখনও শুঁড়িখানার মানে জানতাম না। কিন্তু আমার বন্ধু খুব অল্প-সল্প যখন এদিক-ওদিক কোথাও যেতেন, যেমন যখন তিনি পড়াশুনোর জন্য কোথাও যেতেন তখন সবসময়ই তিনি মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু সেটা তার দোষ নয়। তিনি মদ্য পান করার জন্য প্রভূত পরিমাণে নৈশাহার নিতেন এবং ইংল্যান্ডে মদ্য ছাড়া নৈশাহার কখনই সম্পন্ন হয় না।

ভারতীয় ছাত্রদের তুলনায় ওড়ানোর জন্য শ্রীলঙ্কার ছাত্রদের হাতে প্রভূত টাকা পয়সা রয়েছে। স্থানগত বনেদীয়ানায় স্বীকৃত যে সব শ্রীলঙ্কানরা লন্ডনে পড়াশুনো করতে যান, দেখা গেছে সেখানকার ব্যাঙ্কে তাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। আমরা ভারতীয়রা সেখানে প্রায়শই উপবাসে, অর্ধাহারে দিন কাটাতাম। শ্রীলঙ্কাতেও এই আর্থিক বৈষম্যটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সিংহলী ও ভারতীয়দের মধ্যে। ভারতীয়রা সাধারণত সেখানে গরীব, অন্যদিকে সিংহলীদের নিজস্ব ভূমি এবং তাদের অধিকাংশরই ব্যবসা রয়েছে ও তা ভালোই চলছে। তাই এটা বলা চলে সেখানকার লড়াইটা এক জাতি বনাম আরেক জাতির নয়, বরং ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের লড়াই।

আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যে শ্রীলঙ্কানরা ভারতীয়দের ওপর কোনও কারণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। ঠিক যেমন আমেরিকার ওপর বিশ্বের অধিকাংশ দেশই ক্ষুব্ধ। আমার সেই বন্ধুটির কাছে ভারতের বিষয় যখনই উত্থাপিত হতো, তখনই তিনি মুখ লাল করে ফেলতেন, কখনও কখনও তো ঘর থেকে বেরিয়েই যেতেন। এমনকী, তার বন্ধুদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হতো। যেহেতু সিংহলীদের দেখতে কম-বেশী ভারতীয়দের মতোই সুতরাং ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের গুলিয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই সহজ সরল সত্যিটাও তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল ভারতীয়দের ওপর। তারা (সিংহলীরা) খুব কমই আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করত। সাধারণ ভারতীয় রেস্তোরাঁগুলিকে এড়িয়েই চলত। অবশ্যই সেই সিংহলীরাই এটা করত, যারা ভারতীয় বংশোদ্ভুত নয়। যখন দু'ধরনের সংস্কৃতির সংঘর্ষ বাঁধে, তখনই সমস্যার সূত্রপাত হয়;বিশেষত একটি প্রকারের সংস্কৃতি যখন ক্ষমতার গর্বে গর্বোদ্ধত হয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলকে অবদমিত করার নিরন্তর প্রয়াস চলায়, যেমন — ভারতের ক্ষেত্রে যে প্রয়াস প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় এবং সিংহলী সংস্কৃতির মধ্যে খুব একটা বেশী ব্যবধান নেই, ঠিক যেমনটা দেখা যায় আমেরিকান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে পূর্বতন (আমেরিকান সংস্কৃতি) পরবর্তীর (ইউরোপীয় সংস্কৃতি) একটি প্রশাখারূপেই বিরাজিত। কিন্তু আপনি যদি ইউরোপীয়দের বলতে যান যে তাদেরকে অনেকটা তাদের আমেরিকান তুতোভাইদের মতোই দেখতে তবে তারা ভাবতে পারে যে আপনি অপমান করছেন তাদের। এ বিষয়ে আমি একজন বিলেতীয় ছাত্রের ওপর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। তাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখেছিলাম যে, বিলেতি ছাত্রটি আমেরিকানদের সম্পর্কে

শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

শত্রুতামূলক কথাবার্তা বলছে। কিন্তু এটাও ধ্রুত সত্য যে, ঐ সময় হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা সর্বতোভাবে বৃটেনকে সাহায্য করছিল।

এমনিতে আমেরিকানদের সবকিছুই বৃটিশদের কাছে কৌতুকের বিষয়। যেমন খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে, আচার-আচরণের ক্ষেত্রে, এমনকী, উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বিলেতীয় খোঁটা সহ্য করতেই হয় মার্কিনদের। যেমন আমার কাছে এক দোকানী একবার জাহির করতে চাইছিলেন যে আমেরিকান খদ্দেররা এমন বিচিত্র ভাষায় উচ্চারণে তাঁর কাছে জিনিসপত্র সব চায় যে তার মাথামুন্ডু তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। যদিও আমার মনে হতো যে, ওই দোকানীর তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে সেই আমেরিকান খদ্দেরদের প্রাণজুড়োন ডলার সঞ্চিত স্ফীত হয়ে ওঠা ট্যাঁকের দিকে! যুদ্ধের পর থেকে বৃটিশরা একটা জিনিস উপলব্ধি করেছিল, বিগত এক শতাব্দী ব্যাপী বৃহৎ সাম্রাজ্যের (লেখক, বহু বৃটিশ উপনিবেশ দ্বারা গঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা বোঝাতে চাইছেন) অধিকার তাঁরা খোয়াতে চলছেন। জগতে তাদের এই পদচ্যুতিতে খলনায়কের ভূমিকায় রয়েছে যুদ্ধটি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)। এরপর আর গ্রেট বৃটেনিয় সত্ত্বা নয়, আমেরিকাই শাসন করেছে পরিবর্তনের উত্তাল তরঙ্গটিকে। এবং বৃটিশরা সেই ছবি থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমি কখনও শ্রীলঙ্কা যাইনি এবং কোনও ধারণাও নেই যে কি করে পরিস্থিতি এভাবে হাতের বাইরে চলে গেল। সত্যিই কি তামিলরা ভেবেছিল, তারা তাদের জন্য আলাদা জায়গা হয়তো ছিনিয়ে নিতে পারবে, শুধুমাত্র নিছক একটু জায়গা নয়, পুরো একটা জাতিকেই, কেবলমাত্র এই কারণেই যে তারা সিংহলীদের সঙ্গে একই যানে সওয়ারী হতে পারবে না। এই জিনিসটা তখনই হওয়া সম্ভব যখন এর সঙ্গে কোনও কায়েমী স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু দেশের মধ্যেকার কোনও বড় শক্তিকেই দেশ বিভাজনে খুব একটা আগ্রাহান্বিত দেখাচ্ছিল না। দেশভাগের সময় ভারতেও কিন্তু এর একটা নজির দেখা গেছিল। মুসলিমরা হিন্দুদের সঙ্গে একসাথে থাকতে চায়নি শুধু এর জন্যই কিন্তু ভারত ভাগ হয়নি। এটা ঠিক, যে এরকম (মুসলিমদের হিন্দুদের সঙ্গে একসাথে থাকতে না চাওয়া) হতেই পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য, বৃটিশরা তাদের নিজস্ব স্ট্রাটেজীর জন্যই ভাঙ্গতে চেয়েছিল এই উপমহাদেশকে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এরকম ফ্যাকটার কাজ করেনি।

আমি তামিল ভাই ও বোনেদের জন্য আন্তরিকভাবে বেদনা অনুভব করি কারণ তারা যুদ্ধের জন্য অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছে, কিন্তু শেষে কিছুই পায়নি। এখন তারা আবার খোঁচা খেয়ে ভেঙ্গে যাওয়া জীবনটাকে পুনরায় জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। পৃথিবী একটা নিষ্ঠুর জায়গা এবং মানুষ একটি নিষ্ঠুর প্রাণী। ভারতের উচিত সর্বতোভাবে তামিলদের সাহায্য করা, তারা যে দেশেরই (ভারত কিংবা শ্রীলঙ্কা) হোন না কেন। এটা মাথায় রাখতে হবে যে তারা আমাদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব। এবং সেই সাথে তাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্কের কথাটাও ভাবা দরকার যে তাদের দেহেও ভারতীয় রক্তই প্রবহমান এবং যে রক্ত আমাদের (ভারত ও শ্রীলঙ্কা) এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। এটা ভাবার কোনও বিষয় নয় যে ভাগ্য কোথায় আমাদের নিয়ে এসেছে বা আগামী দিনে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। **(লেখক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ)**

১৮৫৭-র মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে বহুভাষিক নাট্যোৎসব 'নাট্যাঞ্জলি'

বিকাশ ভট্টাচার্য।। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম (১৮৫৭) মুক্তি সংগ্রামের সার্ধ-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চ ল সংস্কৃতি কেন্দ্র (ই জেড সি সি) তাদের কলকাতার সল্ট লেকস্থিত 'ভারতীয়ম্' মঞ্চে পাঁচ দিন ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল — নাট্যাঞ্জলি। সহযোগিতায় ছিল সঙ্গীত নাটক একাদেমি, নয়াদিল্লী। উৎসব চলেছে ৯ জুন থেকে ১৩ জুন। প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

পাঁচটি নাটকের দুটি ছিল বাংলা। একটি করে হিন্দী, ছত্তিশগড়ি ও ওড়িয়া। প্রতিটি নাটকের বিষয়বস্তু ১৮৫৭ বা সেই সময়ের বৃটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম। যদিও সার্ধ-শতবর্ষ পার হয়ে গেছে ২০০৭-এ। তবু দেরিতে হলেও ভারত সরকার বা তার আমলাদের যে ঘুম ভেঙ্গেছে তাই যথেষ্ট। পশ্চি মবঙ্গ সরকারও সম্প্রতি মঙ্গল পান্ডের ওপর একটি নাটক স্পনসর করে ও তা জেলায় জেলায় মঞ্চ স্থ করে তাদের দায় সেরেছে।

ছত্তিশগড়ি বোলাডুলার 'পাহাটিয়া'।

উপস্থাপনার অভিনবত্বে প্রথমেই নাম করতে হয় 'লিভিং থিয়েটার' প্রযোজিত ও প্রবীর গুহ পরিচালিত '১৮৫৭-তারও অতীতে ফিরে যাওয়া' নাটকটির। জার্নি থিয়েটার বা ভ্রমণ নাটক-এর আঙ্গিকে এটি একটি অভিনব নাট্যপ্রয়াস। নাটকে পরিবেশিত ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ১৭৬৩ সাল থেকেই সূচিত হয়েছে ১৮৫৭-এর মহাসংগ্রামের ভূমিকা। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল চাষীদের আন্দোলন, গাজি বিদ্রোহ ছাড়াও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আরও নিদর্শন পাওয়া গেল এই বাংলা নাটকে।

ওড়িয়া নাটক 'বীর সুরেন্দ্র সাই' পশ্চি ম ওড়িশার সম্বলপুরের মুক্তি সংগ্রামী সুরেন্দ্র সাই (১৮২৭-১৮৮৪) -এর জীবন নিয়ে লেখা। শ্রী কালচারাল এসোসিয়েশন প্রযোজিত ও তরুণ নাট্যকর্মী সত্যরঞ্জন বেহেরা ওড়িশার আদিবাসী ও দলিত জনগণ কীভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার কৃতী ছাত্র ডঃ যোগেন্দ্র চৌবে বর্তমানে ছত্তিশগড়ের একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্ব। গুড়ি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সংস্থান বেলোডুলা প্রযোজিত 'পাহাটিয়া' নাটকের নাট্যকার ও নির্দেশক ডঃ চৌবে ছত্তিশগড়ি স্টাইলে সম্পূর্ণ লোককলা আঙ্গিকে এই নাটকে এক রাখাল ছেলে পাহাটিয়ার মুখ দিয়ে এই নাটকটি বর্ণনা করেছেন। অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে পাহাটিয়া কখনও পারালকোটের জমিদার গাঁইদ সিং-এর ১৮২৪-২৫ সালের বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলেছেন, কখনও সোনাগানের বীর নারায়ণ সিং-এর মুক্তি সংগ্রামের বর্ণনা করেছেন। যাঁকে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ফাঁসী দেওয়া হয়। এই নাটকে এই রকম এমন অনেক মুক্তি সংগ্রামের কথা জানা যায়, যাঁরা ইতিহাসে স্থান পাননি কিন্তু আজও ছত্তিশগড়ের গ্রামে গ্রামে পাহাটিয়ার মতো রাখাল বালক যাদের কথা গেয়ে চলেছেন।

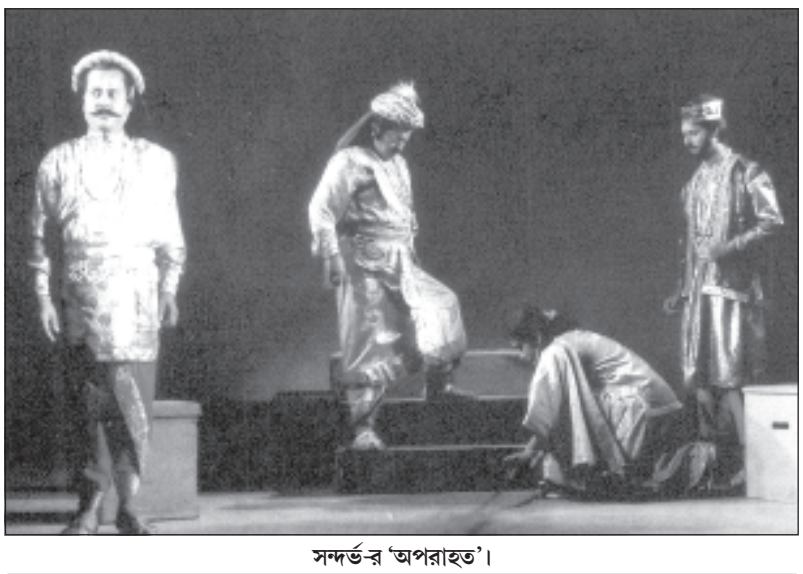

সন্দর্ভ-র 'অপরাহত'।

বিহারের ভাগলপুরের প্রথম সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা তিলকা মাঝি। যিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগঠিত করেছিলেন সেই ১৭৮০ সালে। ১৮৫৭ থেকে ৭০ বছর আগে। দিল্লীর লিভিং অপেরা তাদের হিন্দী নাটক 'তিলকা মাঝি' নিয়ে এই উৎসবে এসেছেন। নির্দেশক শেখ খঁইরুদ্দিন মূলত লোকসঙ্গ ীত, লোকনৃত্য ও লোককলার মাধ্যমে নাটকটি প্রস্তুত করেছেন। নাটকের মূল আকর্ষণ ময়ূরভঞ্জের ছৌনৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশ — যা নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের 'বীর সুরেন্দ্র সাই'।

সন্দর্ভ প্রযোজিত আর একটি বাংলা নাটক 'অপরাহত' নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী প্রমুখ ১৮৫৭-এর বীর যোদ্ধাদের নিয়ে, যা মূলত হিন্দী নাট্যকার হরিকৃষ্ণ প্রেমীর 'শীষদান' নাটকের অনুপ্রেরণায় রচিত।

পূর্বাঞ্চ ল সংস্কৃতি কেন্দ্রকে ধন্যবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আপামর জনসাধারণ ১৮৫৭-এর মুক্তিসংগ্রামে কীভাবে অংশ নিয়েছিলেন, তা বিভিন্ন ভাষার নাটকে তুলে ধরার জন্য। ১৮৫৭-এর মুক্তি সংগ্রামকে সুচতুর ইংরেজরা সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে প্রচার করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে বহু বৃটিশ ভক্ত ভারতীয় ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে এই মহান মুক্তিসংগ্রামকে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

পাঁচদিনের এই নাট্যাঞ্জলি সেই সব অনৈতিহাসিক মিথ্যাচারের যোগ্য জবাব এবং সেই অগণিত মুক্তিসংগ্রামী বীরদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শব্দরূপ - ৫১৬

আর্যরূপ পাল

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
১১		১২	■		■		■
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. এই রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর, ৪. আতশবাজিবিশেষ, ৭. ফারসি শব্দে কুঠার, কুড়ুল, শেষ দুয়ে শক্তি, ৯. কবিগুরু, ১০. যার শেষ নেই, অক্ষয়, ১১. বড় ধরনের কাটারি, প্রথম দুয়ে রঘুবর, ১৩. দাম বা মজুরির আগাম দেওয়া অংশ, ১৪. বিভেদ, পৃথককরণ।

উপর-নীচ ঃ ১. অর্থ, এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর খোল, ২. লোহা বা ইস্পাতের পাতে দাঁত কাটা যন্ত্রবিশেষ, ৩. জল নিরোধের জন্য আলকাতরা মাখানো মোটা কাপড়, ৫. অনেকরূপ, নানারূপ, একে তিনে বিয়ের পাত্র, শেষ দুয়ে অল্প, ৬. দেবরাজ, বাসব, শচীপতি, ৮. 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস-এ যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য, ১০. নির্বোধ, মূর্খ, জানে না এমন, ১১. ইঙ্গ শব্দে দলবেঁধে খুন-জখম, মারপিট, হাঙ্গ ামা, ১২. বিনামূল্যে দেওয়া হয় এমন দানযোগ্য , ১৩. এখানে ছাড় দিতে হবে, ছাঁট, ।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৪

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।
গদাধর মন্ডল ও নরেন্দ্র সোমানী
বোলপুর, বীরভূম।

ম	ভ	প	■	ভ	জ	হ	রি
ঘা	■	স	মু	দ্র	■	■	■
■	খ	রা	■	তা	ম	র	স
■	রি	■	■	■	■	ত্না	■
■	দ্দা	■	■	■	■	ক	■
হা	র	জি	ত	■	প	র	■
■	■	■	রু	মা	ল	■	মা
শী	র্ষ	কো	ণ	■	ক	দ	মা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ আগস্ট ২০০৯ সংখ্যায়।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

বনবন্ধু পরিষদের 'কব আওগে রাম'

কলাকুশলীদের সঙ্গে রাজেন্দ্র জৈন।

বনবাসীরা যেন প্রতীক্ষা করছিল 'কবে রাম আসবেন' তাদের কাছে। রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা সীতাদেবীসহ বনবাসীদের আঙিনায় পৌঁছালেন সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়ে — বনবাসীরা যারপরনাই পুলকিত, আনন্দিত, রোমাঞ্চি ত। তারা রামকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। রামও তাই করলেন। এটাই ছিল বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এবং প্রসিদ্ধ সুরকার রাজেন্দ্র জৈন নির্দেশিত ও রামায়ণ ধারাবাহিকের 'রাম' অরুণ গোভিল-র কণ্ঠ সংযোজিত 'কব আওগে রাম' নৃত্য গীতি আলেখ্য-এর মূল ভাব।

বনবন্ধু পরিষদ বনবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কার-স্বাবলম্বন ও দেশাত্মবোধ জাগানোর লক্ষ্যে ২৯ হাজার একল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কর্মরত। রাজেন্দ্র জৈন স্বীয় উপস্থিতি ও নির্দেশনায় এটাকেই মূর্ত বাণীরূপ দিয়েছেন। বনবন্ধু পরিষদের কলকাতা শাখার বার্ষিক উৎসবে বিড়লা সভাগারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুগায়ক রাজেন্দ্র জৈনের নিজ উপস্থিতি ও তাঁর গাওয়া কয়েকটি রাম-ভজন দর্শক ও শ্রোতাদের উপরি পাওয়া। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা রাজেন্দ্র জৈন-এর মতো শিল্পীর স্বকীয়তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে এক অনবদ্য সার্বিক অনুষ্ঠান — যা মনোরঞ্জনের সঙ্গে আদর্শের সামঞ্জস্যও তুলে ধরেছে।

ভারতীয় লাইফ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট সঙ্ঘের সর্বভারতীয় অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২৮ জুন মহারাষ্ট্রের নাগপুর বিজয়শ্রী কম্যুনিটি হলে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত ভারতীয় লাইফ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন।

ভগবান বিশ্বকর্মা পূজার মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রাস্তাবিক ভাষণে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘদিন ইন্স্যুরেন্স এজেন্টদের নিয়ে সংগঠন করার যে দাবী উঠেছিল এই অধিবেশন তার সার্থক রূপ। সেদিক থেকে এই অধিবেশনকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেন তিনি।

অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সমস্ত সদস্যদের অভিনন্দন জানান ন্যাশানাল অর্গানাইজেশন অব ইনসুরেন্স ওয়ার্কার্স-এর সভাপতি মনোজ গান্ধী সহ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের একাধিক সর্বভারতীয় কার্যকর্তা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় লাইফ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট সঙ্ঘ দীর্ঘদিন ধরেই কেরলে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যে কাজ শুরু করে। এই প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে আত্মপ্রকাশ করল আনুষ্ঠানিকভাবে, সারা দেশের চারশোরও বেশী সদস্য এই অধিবেশনে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৫ জন যোগদান করেন।

নবগঠিত সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন টি রাজন পিল্লাই। সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস এবং কোষাধ্যক্ষ — মৃণাল কর্মকার।

পরলোকে অমলাদেবী ভট্টাচার্য

গত ১৭ জুন শিলচরে পরলোক গমন করেছেন শ্রীমতী অমলা ভট্টাচার্য। তিনি দক্ষিণ অসম প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ অধ্যাপক শঙ্কর ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। শঙ্করদা দীর্ঘদিন সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার কারণে তাঁর বাড়িতে সঙ্ঘের অনেক সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক অধিকারীদের নিত্য যাতায়াত ছিল। তার ফলে শ্রীমতী ভট্টাচার্য ছিলেন সত্যিকার সঙ্ঘ-অন্ত-প্রাণ। স্বয়ংসেবক মাত্রই ছিল পুত্রবৎ। মাঝে মাঝে সঙ্ঘের অম্বিকাপট্টির কার্যালয়ে এসেও সকলের খোঁজ নিতেন। সঙ্গে অবশ্যই সবার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসতেন।

অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর

(৮ পাতার পর)

ব্যক্তিগত ক্যারিশমা ছাড়া বিরোধীদের সংগঠন বলতে সেভাবে কিছু ছিল না। কংগ্রেসের যাও বা ছিল, তৃণমূলের তো একদমই কিছু ছিল না। এমতাবস্থাতেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম উত্তর পরিস্থিতিতে গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল দুটো জেলা পরিষদ দখল করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর হলো ওই দুটি জেলা। এছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, নদীয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর — এই ছ'টি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্য দুটি স্তর পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসেবে সিপিএমের থেকে অনেকটা এগিয়ে যায় তৃণমূল। সব মিলিয়ে বিরোধীরা প্রায় ৯টি জেলায় একাধিপত্য বিস্তার করে। রাজ্যের আঙ্গিকে এ এক অকল্পনীয় ও অভূতপূর্ব ফলাফল। সিপিএমের শক্তিশালী সংগঠনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সংগঠনহীনতার এই অসম লড়াই এই ধারণারই জন্ম দেয় — রাজ্যে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর কাজ করতে শুরু করেছে। যে ধারণা দৃঢ় হয়েছে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে। সব মিলিয়ে এ রাজ্য থেকে বিরোধীরা মোট ২৭টি আসন পাওয়ায় এবং সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে ১৬টির মধ্যে ১৩টি পুরসভা দখল করায়। 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি' যখন কাজ করে তখন তা এভাবেই ধূলিসাৎ করে দেয় শাসকদলের দুর্গ।

যে পুরসভাগুলি বিগত তিন দশক ধরে কুক্ষিগত করে রেখেছিল সিপিএম এবং বিরোধীদের সাংগঠনিক অস্তিত্বই যেখানে বিলুপ্ত, সেখানেও তৃণমূল স্তরের নির্বাচনে কিন্তু জয়ী হয়েছেন বিরোধীরা।

অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টরের চরমতম একটা প্রমাণ দেওয়া যাক। এই ফ্যাক্টর অনুযায়ী যেখানে যে বিরোধী প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি অধিকাংশ বিরোধী ভোটই জমা হয় সেই ভোট বাক্সে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে পাহাড়ের সংগঠিত ভোটের কারণে জেতার সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা ছিল যশবন্ত সিংহের। সেই কারণে সমতলের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি অঞ্চলে কংগ্রেসের থেকে বেশ কিছু ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন তিনি।

আবার ওখানকারই সদ্যসমাপ্ত পুরনির্বাচন অর্থাৎ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে বিজেপির তুলনায় কংগ্রেস বেশ খানিকটা বেশী ভোটে এগিয়ে যায় কারণ তারাই ছিল ওই মহকুমা পরিষদ দখল করার দাবীদার।

এতদিন পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জী বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রিগিং, সায়েন্টিফিক রিগিং এবং ই ভি এমে কারচুপির অভিযোগ হানতেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতেও যে তেমন কিছুই হয়নি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। সেই আগের মতো (শৈলেন দাশগুপ্ত বা অনিল বিশ্বাসের আমলের) জোশ না থাকলেও সিপিএমের রিগিং কৌশল একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাই এই অবিশ্বাস্য ফলের একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ব্যবধানে সরকার বা শাসক বিরোধী মনোভাব জাঁকিয়ে বসেছে রাজ্যে। তবে একথাটাও পাঠকদের জেনে রাখা দরকার। তৃণমূলের এই রমরমাবাজার স্রেফ শাসকবামফ্রন্ট বিরোধী একটি আপাত বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি হিসেবেই। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, দীর্ঘ সিকি শতাব্দী ধরে কট্টর বামবিরোধিতার ফসল ঘরে তুলছেন মমতা। তৃণমূলের প্রাপ্ত সব ভোটই তাদের নয়। রাজ্যের নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় উন্নয়ণ এখন আর কোনও ইস্যু নয়। গুরুত্ব পাচ্ছে তেত্রিশ বছরের অপশাসন থেকে মুক্তির প্রশ্নটি।

তাই রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সব ভোটই জমা পড়ছে তৃণমূলের ভাঁড়ারে, শুধুমাত্র অপশাসন থেকে মুক্তির আশায়।

এই 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টরে'র ট্রেন্ড ২০১১ অবধি অক্ষুণ্ণ থাকলে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও যে পাবে না সিপিএম — একথা হলফ করে বলাই যায়। ইতিহাস বলছে, এই ট্রেন্ড অক্ষুণ্ণ থেকেছে বারেবারেই।

চিত্রকূটের দ্রষ্টা নানাজী দেশমুখ

(৯ পাতার পর)

পাউডার তৈরি, ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ স্থায়ী রোজগারের সন্ধান পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন হাতের কাজের শিক্ষা। রেডিও টেলিভিশন সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিকের কাজ করে তরুণরা উপার্জন করছে। স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিয়েও অনেকে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করছে।

নানাজী দেশমুখের ডি আর আই-এর মাধ্যমে আজ চিত্রকূটের যা উন্নয়ণ হয়েছে, তা কোনও সরকারের উদ্যোগেও সম্ভব হ'ত না। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি তৈরি হ'ত। নানাজী প্রকৃত সমাজসেবীর পরিচয় নিয়েই এলাকার উন্নয়ণে মেতেছেন। আজও বয়সের ভারকে লঘু ভেবে মনে-প্রাণে উন্নয়ণের জন্য দিন-যাপন করছেন।

ধর্মকে বাদ দিয়ে যে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না, একথা মহাপুরুষরাও বারবার বলেছেন। নানাজী তাঁর ডি আর আই-এর মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন 'রাম দর্শন'। রাম দর্শনের মাধ্যমে রামায়ণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীরামের ছবি, উদ্ধৃতি প্রভৃতি ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে রাম দর্শনে। শুধু তাই নয়, আজকের সমাজেও ভগবান শ্রীরামের স্মরণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কেন। এসবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে 'রাম দর্শন'-এর মাধ্যমে। উন্নতমানের আলোচনা, ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকের কথা রাম দর্শনের মাধ্যমে আধুনিক তরুণ-তরুণীরাও জানতে সক্ষম হচ্ছে। নিজেকে বিচার করতে পারছে তারা। এ যেন সমাজের দর্পণ। নানাজী ৯৩ বছর বয়সেও থেমে যাননি।

সম্প্রতি আরও একটা নতুন কর্মসূচী প্রবর্তন করেছেন তিনি। 'সমাজ শিল্পী দম্পতি' — নামে এই কর্মসূচীর মূল অঙ্গ স্নাতক স্তরের দম্পতি। এক এক দম্পতি পাঁচটি গ্রামের উন্নয়ণের দায়ভার সামলাবেন। ওই দম্পতিই দেখভাল করবেন গ্রামবাসীদের। ডি আর আই প্রকল্পের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তাঁরাই তা দেখাশোনা করবেন। নানাজী এককভাবে চিত্রকূটবাসীকে, চিত্রকূটের সমাজকে যা উপহার দিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত এমন নজির মেলে না। সদিচ্ছা থাকলে উন্নয়ণের লক্ষ্যে এগিয়ে সফল হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শন তিনি ভারতবাসীর কাছে রেখেছেন। রাজনীতি থেকে সরে এসে সমাজ উন্নয়ণের পথে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন উন্নয়ণের নতুন দিশা। তীর্থক্ষেত্র হলেও উত্তরপ্রদেশ সরকারের নজর ছিল না চিত্রকূটের উন্নয়ণে। চিত্রকূটের দুর্দশার ছবি পাল্টে দিয়েছেন নানাজী। বয়স ৯৩ হলেও, মনের বল, সদিচ্ছায় কোনও ভাটা পড়েনি। গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজ্যের স্বপ্ন পূরণকারী নানাজী আজও জাতি ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে— তাঁর পরিচয় শুধুই নানাজী দেশমুখ। নানাজীর কাজই তাঁর পরিচয়।

সি পি এম দিশাহারা

(৫ পাতার পর)

লিপিবদ্ধ করেছে। প্রকাশ কারাত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বলেছেন যে পার্টিতে শুদ্ধিকরণের রূপরেখা নিয়ে একটি নির্দেশিকা তৈরি হবে। হায় প্রকাশ কারাত! আপনি কেরলের পার্টির দায়িত্ব নিয়ে কেরলের পার্টিকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আপনি শুদ্ধিকরণ করবেন? যিনি নিজের স্ত্রীকে পলিটব্যুরোতে আনলেন, তিনি পার্টির শুদ্ধি করবেন। যা'হোক পশ্চিমবঙ্গের পার্টির দুর্বলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে প্রকাশ কারাত এবং সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সমালোচনার বিরুদ্ধে বিমান বসু মৃদু গুঞ্জন করলেও নিরুপম সেন বস্তুত প্রকাশ কারাতদের সমর্থন করেছেন — এতে বিমান বসু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠদের বলেছেন — "আমি যখন পার্টি সম্পাদকের দায়িত্ব পেলাম তখনই পার্টির এই সঙ্গীন অবস্থা। সমস্যা এলে শুধু টোটকা কায়দায় সমাধান করা হোত, পক্ষান্তরে অনিল বিশ্বাস-এর জমানার সমালোচনা করছেন। তিনি রাজ্য পার্টির সম্পাদক হয়েই অনিল অনুগামীদের সরাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সুযোগ এসে গেল, অনিলবাবু নদীয়াতে মৃদুল দে-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই এখন নদীয়া পার্টিতে চারটি গোষ্ঠী। নদীয়া পার্টির দায়িত্ব এখন বিমান বসুর। এখানে বলা দরকার বিমান বসুর সঙ্গে বর্ধমান লবির মদন ঘোষ সব সভাতেই যান। বর্ধমান গোষ্ঠীর টার্গেট হল রাজ্য পার্টির সম্পাদক হিসাবে মদন ঘোষকে আনা। বর্ধমান গোষ্ঠীর টার্গেট হল নিরুপম সেন-কে মুখ্যমন্ত্রী করা। তাঁরা বলছেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলোচনা করে পার্টির সর্বস্তরের নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, বুদ্ধ বাবু যদি পরাজিত হন, তবে নিরুপম সেনই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এদিকে বর্ধমান জেলা পার্টির একাংশের মধ্যে নিরুপম-এর বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা উঠেছে। বর্তমানে সিপিএম-এর এমন কোনও রাজ্য নেতা অথবা জেলা নেতা নেই যাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা নেই। পার্টির মধ্যে নেতৃত্বের মর্যাদা তলানিতে ঠেকেছে।

পার্টিতে এখনও নীচের তলার একদল কর্মী বলছেন — "আমরা ২৩৫ ওরা ৩০, একথা বলার পর মার কা বদলা মার কেন হল না?" তাই মঙ্গলকোট নিয়ে এই অংশ বলছে — এই পথ সঠিক! সর্বনাশ আসছে। আজকের সিপিএম দিশাহারা। নেই কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী — নেই কোনও সাংগঠনিক বাঁধন — "গো অ্যাজ ইউ লাইক অর্থাৎ যথা অভিরুচি অনুযায়ী চল।" পার্টি কয়েকটা গোষ্ঠীর একটা ফেডারেশন-এ পরিণত হয়েছে। বিনাশকালে পার্টির বিপরীত বুদ্ধি দেখা দিয়েছে। এর জন্য প্রধানত নেতৃত্ব দায়ী, এই নেতৃত্বই মানে জ্যোতি বসু সহ। যতই দিন এগোচ্ছে পার্টির ক্ষয় দ্রুত এগোচ্ছে। পারার -ঘা সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছে। বিশল্যকরণী এই মৃত্যুকে কি বাঁচাতে পারবে? না, আদর্শহীন পার্টির মৃত্যু কি অনিবার্য নয়?

মঙ্গলকোটে বিধায়ক নিগ্রহ-এর প্রতিবাদে ১২ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছিল কংগ্রেস। সেই বন্ধ-এর দিনে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ — ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস বিডিও অফিস ভাঙচুর করা হয়। কম্পিউটার-আসবাবপত্র চুরমার করা হয়। একটি বাজারি দৈনিকে লেখা হয়েছে — "কংগ্রেস প্রাণ পেল।"

মঙ্গলকোটে বিধায়কদের নিগ্রহ এবং বন্ধের দিনের তান্ডব-এর সময়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

সিপিএম-এর একাংশ চায় যে বিরোধী দলগুলি বিশৃঙ্খলা করুক — জনগণ দেখুক। শেষমেশ যদি ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ হয় তবে সিপিএম "শহিদ" হয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যাবে। তাতে জনসাধারণের সহানুভূতি কাড়তে সুবিধা হবে।

Swastika
27 July - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

উরুমকিতে মারমুখী হান চীনারা।

আল কায়দার রোষে এবার চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জিনজিয়াং প্রদেশে জাতি দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দুনিয়া ও চীনের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। গত ৬ জুলাই জিনজিয়াং প্রদেশের রাজধানী উরুমকিতে ভয়ঙ্কর জাতিদাঙ্গায় প্রায় ১৫০ জন নিহত, হাজারের কাছাকাছি লোক আহত হন। ওই প্রদেশের সিংহভাগ নাগরিকের ধর্মই ইসলাম। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ ওখানকার বাসিন্দা স্থানীয় ন'টি জনজাতি একত্রিত হয়ে উইগুর ইসলামে দীক্ষা নেন। উইগুর কথার অর্থ ন'টি জনজাতির সমাহার। উইগুররা ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও বর্তমানে তাদের বেদখল হওয়া জিনজিয়াং প্রদেশের শাসন ভারটা হান চীনাদের হাতে চলে গিয়েছে। বর্তমানে জিনজিয়াং -এ উইগুররা রয়েছেন ৪৫ শতাংশ ও হান চীনারা ৪০ শতাংশ।

কিছুদিন আগেই দক্ষিণ চীনের সাওগুয়ানে একটি খেলনা কারখানায় উইগুর সম্প্রদায় ও হান চীনাদের সংঘর্ষে উইগুরদের দুই শ্রমিক মারা যান। ওই ঘটনার পর থেকেই জিন জিয়াং সরকারের বিরুদ্ধে উইগুরুদের অসন্তোষের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছিল। এই অসন্তোষ থেকেই গত ৬ জুলাই পথে নেমেছিল উইগুররা। কিন্তু বিক্ষোভ প্রথমে শান্তিপূর্ণ থাকলেও পরে সেই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারত সীমান্ত ঘেঁষা এই প্রদেশ জুড়ে। হান চীনাদের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে হতাহতের পরিমাণ দেড় হাজারের গন্ডী ছাড়ায়। ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশও। শান্তি রক্ষার জন্য উরুমকিতে জুম্মাবারে মসজিদে নামাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে। এতে আরও চটে যায় উইগুররা।

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে মুসলিম

চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও

মৌলবাদীদেরও। মুসলিম দুনিয়ার প্রতি অন্যায় হয়েছে, আর তাঁরা (মৌলবাদীরা) মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন — এমন ঘটনা ভূ-বিশ্বে কোথাও ঘটেনি! তাই বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য একটা অকল্পনীয় ও অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। গত ১৩ জুলাই প্রথম শ্রেণীর চীনা দৈনিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট আন্তর্জাতিক বিষয়ে গবেষক স্টিরলি অ্যাসিয়ান্টকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে, লাদেনপন্থী আল কায়দার ডানহাত AQIM (আল কায়দা ইন দ্য ইসলামিক মাঘরেব) সরকারিভাবে চীন আক্রমণের হুমকি দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনগুলোকেও তাদের এই কর্মসূচী (চীন আক্রমণ) অনুসরণ করতে বলেছে। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের পূর্বে আফগানিস্তানোত্তর পরিস্থিতিতে আল কায়দার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল প্রায় হাজার খানেক উইগুর-ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এমনিতে চীনের সঙ্গে মুসলিম দুনিয়ার সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। কিন্তু পরিস্থিতিটা পাল্টেছে মার্কিন প্রশাসনের মাথায় এবছরের গোড়ায় ওবামা আসার পর। বারাক হুসেন ওবামা'র মুসলিম প্রীতি ৯/১১-এর পরে আবার মুসলিম-মার্কিন নয়া সম্পর্কের দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই সম্পর্কের মোড়কেই বেজিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে মুসলিম দুনিয়ার। তার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথমবারের জন্য চীনকে এধরনের হুমকি শুনতে হল বলে আন্তর্জাতিক মহল মনে করছে। চীন সরকারিভাবে যা বলেছে, তা হল উইগুর নেত্রী রেবিয়া কাদেরের নেতৃত্বে জিনজিয়াং প্রদেশে ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই এই দাঙ্গা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় — এমনটাও দাবী চীনা প্রশাসনের।

'উইগুর ইসলাম' শব্দটি অনেকের কাছে অপরিচিত হতে পারে, চীনাদের কাছে কিন্তু মোটেও অপরিচিত নয়। আগেই লেখা হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে পামির মালভূমিতে নয়টি জাতির সমাহারে দীক্ষিত হওয়া উইগুর ইসলামীরা অন্যান্য ইসলামীদের তুলনায় বেশ সহনশীল বলেই পরিচিত। শুধু জিনজিয়াং প্রদেশেই নয়, চীনের রাজধানী বেজিং-এ খাবারের দোকান, পানীয়র দোকান এবং সঙ্গীতে তাদের খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের দিক দিয়েও ঘটনাটা কিন্তু গভীর উদ্বেগজনক। জিনজিয়াং প্রদেশ ভারত সীমান্ত লাগোয়া। প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে এই প্রদেশের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। কুষাণসম্রাট কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম খোটান, কাশগড় অবধি বিস্তৃত ছিল। এই দুটি প্রদেশই বর্তমান জিনজিয়াং প্রদেশের অন্তর্গত। জিনজিয়াং প্রদেশের ইতিহাসটা বেশ করুণ। ১৭৫৯ সালে চীনের মাঞ্চু রাজারা ওই এলাকার দখল নেন। ১৮৬৪ সালে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সওয়া এক দশক ধরে তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, উজবেকিস্তানের দখলে ছিল এই প্রদেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মুখে 'তুর্কিস্তান' নামে ওই অঞ্চলটি এক স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা পায়। কিন্তু ১৯৪৯ সালে তুর্কিস্তান দখল করে চীন। সৌজন্যে মাও-জে-দঙ্। চীনা অন্তর্ভুক্তিতে তার নাম হয় জিনজিয়াং প্রদেশ। হান চীনাদের প্রতি অসম্মান করার অভিযোগে গত এক দশকে জিনজিয়াং প্রদেশে উইগুরদের দু'শ জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে।

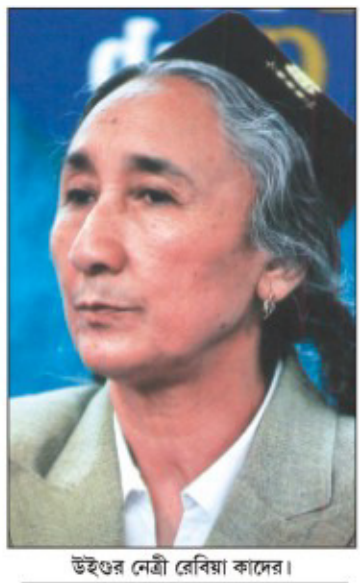
উইগুর নেত্রী রেবিয়া কাদের।

প্রখ্যাত সাংবাদিক চন্দন মিত্রের মতে, চীনের পাঁজর সহজেই ভেঙে দেওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, "চীনারা দুটো ব্যাপারে বরাবরই বেশ গোঁড়া। জাতিগত বিভাজন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন — এই তালিকায় একদম সামনে থাকবে। আসলে, গত অলিম্পিকের পূর্বে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা যেভাবে দলাই লামার দৌলতে প্রকাশ্যে এসেছিল, জিনজিয়াং-এ উইগুরদের ওপর হামলা কিন্তু সেভাবে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায়নি। নইলে জিনজিয়াং-এ যা ঘটেছে তা কোনও অংশে সেই ঘটনার চেয়ে কম নয়। বরঞ্চ

দাঙ্গায় ভস্মীভূত গাড়ি ঘিরে জনতা।

ঘটনাটির গুরুত্ব বহুগুণ বেশি।

কারণ যুযুধান দু'পক্ষই ভারত-বিরোধী। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সংঘর্ষের ঘটনাটাও ঘটেছে আমাদের দেশের সীমান্ত ঘেঁষে। সুতরাং ভারতকে যে খুব সতর্ক থাকতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

সবার নিমন্ত্রণ

আগামী ১৩ আগষ্ট পারিবারিক দুর্গাপূজা (আনত) উপলক্ষে সকল আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ।

--বিনীত, শুভাশিষ দেবনাথ, ধর্মপত্নী - শ্রীমতী কাজল দেবনাথ
রঙ্গতবাজার, মধ্য আন্দামান

এই শুভদিনে সিটিজেন্ট ব্যাঙ্ক (রঙ্গতবাজার, মধ্য আন্দামান-)-এর মধ্যস্থতা ও সহায়তায় মারুতি ও সুজুকি গাড়ীর বিক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন--

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, মাননীয় সাংসদ, আন্দামান।
শ্রীমতী রূপা রায়, তাঁর ধর্মপত্নী,
শ্রীমতী গীতিম নন্দাজী, কোম্পানীর জিলার। ● শ্রীঅরবিন্দ কুমার (সি এম)
ভাস্কর রাও (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) ● শ্রীবিশ্বজিৎ লাহিড়ী (সমাজসেবী)

স্থান ঃ রঙ্গতবাজার, মধ্য আন্দামান, বিক্রয় এজেন্ট - শুভাশিষ দেবনাথ, ৯৪৭৪২১৪১৪১

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com